অক্টোবর ২০২১ ■ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৮

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

শেখ রাসেল দিবস আবেগ ও স্মৃতিমাখা একটি স্মরণীয় দিন

আমার প্রিয় লেখক শেখ হাসিনা

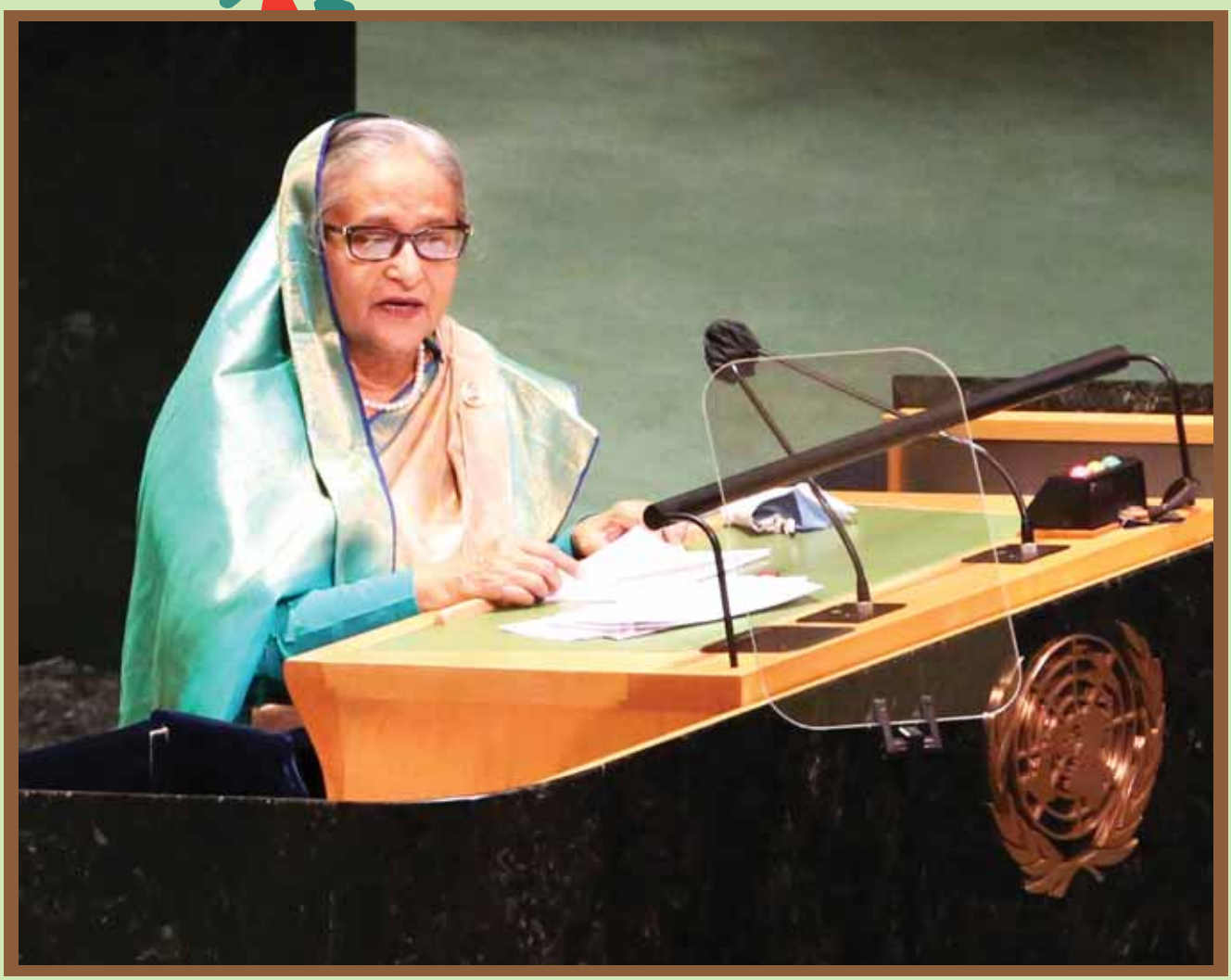

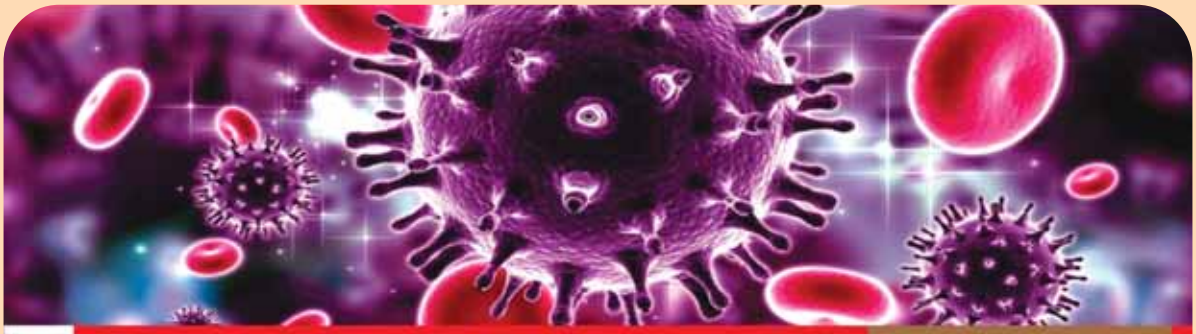

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

অক্টোবর ২০২১ ⌟ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৮

হাসু বুবুকে শেষ চিঠি

লক্ষ্মী বুবু আমার,
আমার বাড়ি ফিরতে না পারার কথাটা
তুমি বাংলার আকাশ বাতাসকে জানিয়ে দিও
যাতে সেই বিড়াল, লক্ষ্মীপেঁচা, কাঠবিড়ালি
আর আমার সেই পায়রাগুলো খবর পায়;
আমার যে আর বাড়ি ফেরা হবে না।

ইতি
তোমার আদরের রাসেল

– কনক চৌধুরী

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে সেপ্টেম্বর ২০২১ নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বিশ্বব্যাপী করোনা টিকাকে বিশ্বসম্পদ বিবেচনা করে মহামারি মোকাবিলায় সর্বজনীন ও সাশ্রয়ী মূল্যে টিকার প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের ওপর গুরুত্ব দেন। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ধ্বংসাত্মক প্রভাব কাটিয়ে উঠতে ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসকরণ, করোনাকালে শিক্ষাব্যবস্থা চলমান রাখতে জাতিসংঘের অংশীদারিত্ব ও প্রয়োজনীয় সম্পদ নিশ্চিতকরণ, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে টেকসইভাবে উত্তরণ, করোনা মহামারির সংকটকালে অভিবাসী গ্রহণকারী দেশগুলোকে অভিবাসীদের সঙ্গে ন্যায়সংগত আচরণ করা এবং তাদের কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ও রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব তুলে ধরেন। তিনি রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জোরালো ভূমিকা ও অব্যাহত সহযোগিতার আহ্বান জানান। *সচিত্র বাংলাদেশের* অক্টোবর ২০২১ সংখ্যায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণটি ছাপানো হলো।

১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোটো ভাই শেখ রাসেল ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরাজিত শক্তি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার নির্মমভাবে হত্যা করে। এসময়ে খুনিরা জাতির পিতার শিশুপুত্র শেখ রাসেলকে হত্যা করে। ২০২১ সালের ১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মদিন ও শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এবছরই দিবসটি প্রথম জাতীয়ভাবে পালন করা হয়। এ দিবসকে উপলক্ষ করে রয়েছে প্রবন্ধ ও কবিতা।

১লা অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস। প্রবীণদের সুরক্ষা এবং অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি বার্ধক্যের বিষয়ে বিশ্বব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে এ দিবসটি পালিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ও সাইক্লোন প্রিপিয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম (সিপিপি)-এর ৫০ বছর পূর্তি, বিশ্ব খাদ্য দিবস, জাতিসংঘ দিবস, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে রয়েছে নিবন্ধ। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে নিবন্ধ, গল্প, কবিতা ও নিয়মিত বিভাগ রয়েছে।

আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
ডায়ানা ইসলাম সিমা

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৯৭
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ/সাক্ষাৎকার

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ ৪

শেখ রাসেল দিবস: আবেগ ও স্মৃতিমাখা একটি স্মরণীয় দিন ৭
খালেক বিন জয়েনউদদীন

সম্মানের সঙ্গে প্রবীণদের সেবা দিন নিজের স্বস্তিময় বার্ধক্যের প্রস্তুতি নিন ৯
প্রফেসর ড. এ এস এম আতীকুর রহমান

সোনার বাংলা গঠনে বঙ্গবন্ধুকন্যা ১২
প্রফেসর ড. প্রিয়ব্রত পাল

শান্তির দূত: বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ১৫
সৌরেন চক্রবর্ত্তী

আমার প্রিয় লেখক শেখ হাসিনা ১৭
সৈয়দা নাজমুন নাহার

বাংলাদেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা ২৩
ড. এন. এইচ. এম. রুবেল মজুমদার

জাতিসংঘ দিবস: জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ভাষণ ২৬
ড. আবদুল আলীম তালুকদার

দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন ও সিপিপির ভূমিকা ২৯
ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ

বঙ্গবন্ধুর গ্রামীণ উন্নয়ন ভাবনা ও বঙ্গবন্ধুকন্যার গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সাক্ষাৎকার গ্রহণে এম এ খালেক ৩১

জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি
চলচ্চিত্রের মহাকবি সত্যজিৎ রায় ৩৪
অনুপম হায়াৎ

মুজিব আদর্শ মুক্তিকামী মানুষের পাথেয় ৩৬
মোতাহার হোসেন

জনগণের পাশে শেখ হাসিনা ৩৭
আবু সালেহ মোহাম্মদ মুসা

জাতীয় বাজেটে শিশু বাজেট ও শিশু উন্নয়ন ৩৮
এম. হোমায়েদ নাসের

বাংলাদেশ পোলিও টিকায় রোল মডেল ৪০
সুস্মিতা চৌধুরী

শারদীয় দুর্গাপূজা ৪১
প্রশান্ত কুমার দে

গল্প

রাসেলের নিঃসঙ্গ দিন ৪২

রফিকুর রশীদ

কবিতাগুচ্ছ ৪৪-৪৭

নাসির আহমেদ, প্রজীৎ ঘোষ, অদ্বৈত মারুত, বশিরুজ্জামান বশির, মোহাম্মদ আজহারুল হক, মুহাম্মদ ইসমাঈল, হাসানাত লোকমান, আবুল কালাম আজাদ, নাসিমা আক্তার জাহান, শাহরুবা চৌধুরী, হাসান হাফিজ, আন্‌ওয়ার হুসাইন, দেলওয়ার বিন রশিদ, খোরশেদ আলম নয়ন, মিয়াজান কবীর, নিকুঞ্জ কুমার বর্মন

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি	৪৮
প্রধানমন্ত্রী	৪৯
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	৪৯
আন্তর্জাতিক	৫১
উন্নয়ন	৫১
ডিজিটাল বাংলাদেশ	৫২
শিল্প-বাণিজ্য	৫৩
শিক্ষা	৫৩
বিনিয়োগ	৫৪
নারী	৫৪
সামাজিক নিরাপত্তা	৫৫
কৃষি	৫৫
পরিবেশ ও জলবায়ু	৫৬
বিদ্যুৎ	৫৭
নিরাপদ সড়ক	৫৭
স্বাস্থ্যকথা	৫৮
যোগাযোগ	৫৮
কর্মসংস্থান	৫৯
সংস্কৃতি	৬০
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	৬০
মাদক প্রতিরোধ	৬১
চলচ্চিত্র	৬১
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন	৬২
প্রতিবন্ধী	৬২
ক্রীড়া	৬৩

শ্রদ্ধাঞ্জলি: চলে গেলেন শিশুসাহিত্যিক রফিকুল হক দাদুভাই ৬৪

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই অক্টোবর 'শেখ রাসেল দিবস-২০২১' উপলক্ষে 'শেখ রাসেল-দীপ্ত জয়োল্লাস অদম্য আত্মবিশ্বাস' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন– পিআইডি

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে ভাষণে বলেন, করোনার নতুন ধরনের মাধ্যমে অনেক দেশ বার বার সংক্রমিত হচ্ছে। এ মহামারিতে গোটা বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বহুপাক্ষিকতাবাদ ও জাতিসংঘ ব্যবস্থার দৃঢ়সমর্থক হিসেবে বাংলাদেশ এই সংকটকালে জাতিসংঘকে আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে দেখে। তিনি সব ধরনের মতভেদ ভুলে গিয়ে 'অভিন্ন মানবজাতি' হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সম্মিলিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সবার জন্য আবারও এক সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ে তোলার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ দেখুন, পৃষ্ঠা-**৪**

শেখ রাসেল দিবস
আবেগ ও স্মৃতিমাখা একটি স্মরণীয় দিন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ সন্তানটির নাম শেখ রাসেল। এ বছর রাষ্ট্রীয়ভাবে ভিন্ন পরিবেশে দিবসটি সারা দেশে পালিত হয়। শেখ রাসেল নির্যাতিত-নিপীড়িত শিশুদের প্রতিনিধির প্রতীকে পরিণত হন। রাসেলকে নিয়ে 'শেখ রাসেল দিবস: আবেগ ও স্মৃতিমাখা একটি স্মরণীয় দিন' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-**৭**

আমার প্রিয় লেখক শেখ হাসিনা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠসন্তান, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অভিজ্ঞতার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ক্রমাগত চড়াই-উতড়াইয়ের মাধ্যমে রাজনীতির শীর্ষাবস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি শুধু বাংলাদেশকেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন তা নয়, বিশ্বের একজন সমাদৃত নেত্রীও। এসব পরিচয়ের তুলনায় তাঁর লেখক পরিচয়টি অনুল্লেখ্য হলেও তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনায় দেখিয়েছেন মুনশিয়ানা। শেখ হাসিনার লেখক পরিচয় জানতে 'আমার প্রিয় লেখক শেখ হাসিনা' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–**১৭**

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটেস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে সেপ্টেম্বর ২০২১ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে ভাষণ দেন– পিআইডি

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

২৪শে সেপ্টেম্বর ২০২১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় সভাপতি,

আসসালামু আলাইকুম।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আপনার 'Presidency of Hope' (প্রত্যাশার নেতৃত্ব) টেকসই পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাবে যেখানে কেউ পেছনে পড়ে থাকবে না।

নজিরবিহীন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাধারণ পরিষদের ঐতিহাসিক ৭৫তম অধিবেশনে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য বিদায়ী সভাপতি জনাব Volkan BOZKIR'কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটা আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের যে, আমি এ নিয়ে ১৭ বার জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে আমার দেশ বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছি।

সাধারণ পরিষদের এই ৭৬তম অধিবেশনটি এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন কোভিড-১৯ বিশ্বজুড়ে অব্যাহতভাবে মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। করোনার নতুন ধরনের মাধ্যমে অনেক দেশ বার বার সংক্রমিত হচ্ছে। এ মহামারিতে গোটা বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এ সংকটকালে নিবেদিত সেবা ও আত্মত্যাগের জন্য আমি সম্মুখসারির সকল যোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। কোভিড-১৯-এর নির্মম বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এ অধিবেশনের প্রতিপাদ্য 'প্রত্যাশা' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। বহুপাক্ষিকতাবাদ ও জাতিসংঘ ব্যবস্থার দৃঢ়সমর্থক হিসেবে বাংলাদেশ এই সংকটকালে জাতিসংঘকে আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে দেখে। সব ধরনের মতভেদ ভুলে গিয়ে আমাদের অবশ্যই 'অভিন্ন মানবজাতি' হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে; সম্মিলিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সবার জন্য আবারও এক সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ে তুলতে হবে।

সভাপতি মহোদয়,

এ বছরটি আমাদের জন্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বছর। এ বছর আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করছি। একইসঙ্গে আমরা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন করছি।

আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর আজীবন নিঃস্বার্থ সংগ্রাম ও দূরদর্শী নেতৃত্ব আমাদের এনে দিয়েছে স্বপ্নের স্বাধীনতা। আমি শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি, যাঁদের অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগে আমাদের মাতৃভূমি স্বাধীন হয়েছে।

আমাদের জাতির পিতা ছিলেন বহুপাক্ষিকতাবাদের একজন দৃঢ় সমর্থক। তিনি জাতিসংঘকে জনগণের 'আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র' মনে করতেন।

আমাদের জাতিসংঘ অভিযাত্রার প্রথম দিনে ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে প্রদত্ত তাঁর ঐতিহাসিক একমাত্র ভাষণে তিনি বলেছিলেন– কোট: 'আত্মনির্ভরশীলতাই আমাদের লক্ষ্য। জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও যৌথ উদ্যোগই আমাদের নির্ধারিত কর্মধারা। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অংশীদারিত্ব আমাদের কাজকে সহজতর করতে পারে, জনগণের দুঃখকষ্ট লাঘব করতে পারে।' আনকোট

বঙ্গবন্ধু এমন একটি বিশ্ব গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক অবিচার, আগ্রাসন ও পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি থাকবে না। সাতচল্লিশ বছর আগের তাঁর সে আহ্বান আজও সমভাবে প্রযোজ্য। এজন্য আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের যে-কোনো উদ্যোগে সমর্থন ও নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছি। করোনাভাইরাসের টিকার ন্যায্য হিস্যা দাবি, ফিলিস্তিনিদের প্রতি যে-কোনো ধরনের অবিচারের বিরুদ্ধে আমাদের দৃঢ় অবস্থান, রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান, জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা– এসব আমাদের বৈশ্বিক অঙ্গীকারের কতিপয় উদাহরণ মাত্র।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অপূর্ণ স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল পাঁচটি অর্থনীতির মধ্যে অন্যতম। জিডিপি'তে আমরা বিশ্বে ৪১তম। গত এক দশকে আমরা দারিদ্র্যের হার ৩১ দশমিক ৫ থেকে ২০ দশমিক ৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছি।

এ সময়ে আমাদের মাথাপিছু আয় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২,২২৭ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত সর্বকালের সর্বোচ্চ ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে।

গত এক দশকে আর্থসামাজিক খাতে ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। শিশুমৃত্যু হার প্রতি হাজারে ২৩ দশমিক ৬৭-এ কমে এসেছে। প্রতি লাখ জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যুর

হার ১৭৩-এ হ্রাস পেয়েছে। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে হয়েছে ৭৩ বছর।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের তথ্যমতে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম। ২০১৪ সাল থেকে এ সূচকে বাংলাদেশ আঞ্চলিক প্রতিবেশী দেশগুলোর চাইতে এগিয়ে আছে।

আমাদের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' উদ্যোগ আর্থসামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, নারীর ক্ষমতায়নসহ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে। আমরা ব্যাপকভাবে 'সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী' কর্মসূচির সম্প্রসারণ করেছি। 'টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২১' অনুযায়ী ২০১৫ সাল থেকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রার সূচকে বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রেই এগিয়ে আছে। এ সাফল্যের মূলে রয়েছে নারীর উন্নতি ও ক্ষমতায়নে বিপুল বিনিয়োগ। এ বিনিয়োগ আমাদের রূপান্তরসক্ষম উন্নয়নে বিপুল অবদান রেখেছে।

এ বছর আমরা স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের মাইলফলক অর্জন করেছি। এখন আমাদের স্বপ্ন বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি জ্ঞানভিত্তিক উন্নত দেশ ও ২১০০ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ ও টেকসই বদ্বীপে রূপান্তর করা।

জনাব সভাপতি,

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারির প্রকোপ আশঙ্কার চেয়ে অনেক কম হয়েছে। তৃণমূল পর্যায় থেকে আমাদের শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া এ মহামারি মোকাবিলায় আমাদের সময়োচিত, সমন্বিত ও বহুমুখী উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। জীবন ও জীবিকার ভারসাম্য রক্ষা করতে শুরুতে আমাদের বেশ কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। অর্থনীতিকে সচল রাখতে বিভিন্ন সময়ে আমরা ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের মাধ্যমে প্রায় ১ হাজার ৪৬০ কোটি মার্কিন ডলার বরাদ্দ দিয়েছি, যা মোট দেশজ উৎপাদনের ৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ। করোনাভাইরাসের টিকা সংগ্রহের জন্য চলতি অর্থবছরে বাজেটে ১৬১ কোটি মার্কিন ডলারের সংস্থান রাখা হয়েছে।

অতি দরিদ্র, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন, বিদেশফেরত প্রবাসী ও অসহায় নারীদের মতো সমাজের দুর্বলতর জনগোষ্ঠীর জন্যে পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। গত বছর মহামারির প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকে আমরা প্রায় ৪ কোটি মানুষকে নগদ অর্থসহ অন্যান্য সহায়তা দিয়েছি। সময়োচিত পদক্ষেপ ও আমাদের জনগণের বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলার সক্ষমতার কারণে ২০২০ সালেও আমরা ৫ শতাংশের বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি।

মাননীয় সভাপতি,

অনাদিকাল থেকে মানবজাতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি এবং মানবসৃষ্ট নানা সংঘাত ও দুর্যোগ মোকাবিলা করে আসছে। এতৎসত্ত্বেও বুকে আশা এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে মানবজাতি এসব পাহাড়সম সমস্যা অতিক্রম করে টিকে রয়েছে।

এই মহামারিও এমনি একটি সংকট যেখান থেকে বহু মানুষের টিকে থাকার অনুপ্রেরণামূলক এবং উদারতার উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে। দুঃখজনক হলেও এই মহামারি আরও বেশ কিছু দিন স্থায়ী হবে বলে মনে হচ্ছে। সেজন্য এ অভিন্ন শত্রুকে মোকাবিলা করার জন্য অতীতের যে-কোনো সময়ের চেয়ে এখন আমাদের অনেক বেশি নতুন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈশ্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে আমি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরছি–

প্রথমত, কোভিডমুক্ত একটি বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে টিকার সর্বজনীন ও সাশ্রয়ী মূল্যে প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। গত বছর এ মহতী অধিবেশনে আমি কোভিড-১৯ টিকাকে 'বৈশ্বিক সম্পদ' হিসেবে বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। বিশ্বনেতাদের অনেকে তখন এ বিষয়ে সহমত পোষণ করেছিলেন।

সে আবেদনে তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। বরং আমরা ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে টিকা বৈষম্য বাড়তে দেখেছি। বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, এযাবৎ উৎপাদিত টিকার ৮৪ শতাংশ উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর মানুষের কাছে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, নিম্ন আয়ের দেশগুলো ১ শতাংশেরও কম টিকা পেয়েছে।

জরুরি ভিত্তিতে এ টিকা বৈষম্য দূর করতে হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে টিকা থেকে দূরে রেখে কখনই টেকসই পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। আমরা পুরোপুরি নিরাপদও থাকতে পারবো না।

তাই আমি আবারও আহ্বান জানাচ্ছি, সবার জন্য ন্যায়সংগত ও সাশ্রয়ী মূল্যে টিকার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। অবিলম্বে টিকা প্রযুক্তি হস্তান্তর টিকার সমতা নিশ্চিত করার একটি উপায় হতে পারে। প্রযুক্তি সহায়তা ও মেধাস্বত্বে ছাড় পেলে বাংলাদেশও ব্যাপক পরিমাণে টিকা তৈরি করতে সক্ষম।

দ্বিতীয়ত, এ মহামারি জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোকে অধিকমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক Intergovernmental Panel on Climate Change-এর ওয়ার্কিং গ্রুপ-১-এর প্রতিবেদনে আমাদের এ গ্রহের ভবিষ্যতের এক ভয়াল চিত্র ফুটে উঠেছে।

দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে জলবায়ু পরিবর্তনের ধ্বংসাত্মক প্রভাব কাটিয়ে ওঠা কঠিন হবে। ধনী অথবা দরিদ্র কোনো দেশই এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে নিরাপদ নয়। তাই আমি ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, নিঃসরণের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং টেকসই অভিযোজনের জন্য অর্থায়ন ও প্রযুক্তির অবাধ হস্তান্তরের আহ্বান জানাচ্ছি।

ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম এবং ভালনারেবল-২০ গ্রুপ অব মিনিস্টারস অব ফাইন্যান্স-এর সভাপতি হিসেবে আমরা 'মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা–দশক ২০৩০'-এর কার্যক্রম শুরু করেছি। এ পরিকল্পনায় বাংলাদেশের জন্য জলবায়ুকে ঝুঁকির কারণ নয়, বরং সমৃদ্ধির নিয়ামক হিসেবে পরিণত করার কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।

গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিতব্য 'কনফারেন্স অব পার্টিজ' (COP)-এর ২৬তম শীর্ষ সম্মেলন আমাদের নতুন নতুন অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনার পক্ষে সমর্থন আদায়ের অপার সুযোগ করে দিতে পারে। এ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য সবাইকে আহ্বান জানাই।

তৃতীয়ত, মহামারির প্রকোপে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা চরমভাবে বিপর্যস্ত। জাতিসংঘ শিশু তহবিলের তথ্য অনুযায়ী, করোনাকালে আংশিক বা পুরোপুরি বিদ্যালয় বন্ধের কারণে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নিম্ন আয়ের দেশগুলোর লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর দূরশিক্ষণে অংশগ্রহণের সক্ষমতা ও প্রযুক্তি না থাকায় ভর্তি, সাক্ষরতার হার ইত্যাদি অর্জনগুলো হুমকির মুখে পড়েছে।

ডিজিটাল সরঞ্জামাদি ও সেবা, ইন্টারনেটের সুযোগ-সুবিধার সহজলভ্যতা ও শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করতে হবে। এজন্য আমরা জাতিসংঘকে অংশীদারিত্ব ও প্রয়োজনীয় সম্পদ নিশ্চিত করার জন্য আহ্বান জানাই।

চতুর্থত, কোভিড-১৯ অতিমারির নজিরবিহীন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে আমরা স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পথে

রয়েছি। তবে এ মহামারি অনেক দেশের উত্তরণের আকাঙ্ক্ষাকে বিপন্ন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের টেকসই উত্তরণ ত্বরান্বিত করার জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে আমরা প্রণোদনাভিত্তিক উত্তরণ কাঠামো প্রণয়নে আরও সহায়তা আশা করি। এলডিসি-৫ সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক কমিটির অন্যতম সভাপতি হিসেবে আমরা আশা করি যে, দোহা সম্মেলনের সুনির্দিষ্ট ফলাফল আরও বেশি সংখ্যক দেশকে সক্ষমতা দান করবে, যেন তারা স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে টেকসইভাবে উত্তরণ করতে পারে।

পঞ্চমত, মহামারিকালে প্রবাসীরা অপরিহার্য কর্মী হিসেবে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য জরুরি সেবা খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। তারাও সম্মুখসারির যোদ্ধা। তবুও তাদের অনেকে চাকরিচ্যুতি, বেতন কর্তন, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক সেবার সহজলভ্যতার অভাব ও বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই সংকটকালে অভিবাসীগ্রহণকারী দেশগুলোকে অভিবাসীদের সঙ্গে ন্যায়সংগত আচরণ করার এবং তাদের কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণকে নিশ্চিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

ষষ্ঠত, রোহিঙ্গা সংকট এবার পঞ্চম বছরে পড়লো। কিন্তু এখন পর্যন্ত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের একজনকেও মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়নি। মিয়ানমারে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে অনিশ্চয়তা তৈরি হলেও এ সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করতে আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জোরালো ভূমিকা ও অব্যাহত সহযোগিতা আশা করি। মিয়ানমারকে অবশ্যই তার নাগরিকদের প্রত্যাবর্তনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সহযোগিতা করতে সদা প্রস্তুত।

বাংলাদেশে তাদের সাময়িক অবস্থানকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখতে কিছু সংখ্যক বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিককে আমরা 'ভাসানচর'-এ স্থানান্তর করেছি। আশ্রয় শিবিরে কোভিড-১৯ মহামারির বিস্তাররোধে টিকালাভের যোগ্য সকলকে জাতীয় টিকাদান কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আগেও বলেছি, আবারও বলছি, রোহিঙ্গা সংকটের সৃষ্টি মিয়ানমারে, সমাধানও রয়েছে মিয়ানমারে। রাখাইন রাজ্যে তাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ, টেকসই ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই কেবল এ সংকটের স্থায়ী সমাধান হতে পারে। এজন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই গঠনমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

আমরা আশা করি, আসিয়ানের নেতৃবৃন্দ বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক ইস্যুতে গৃহীত প্রচেষ্টাকে আরও বেগবান করবেন। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ীদের জবাদদিহি নিশ্চিতকরণে গৃহীত সকল কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করতে হবে।

সভাপতি মহোদয়,

আমরা একটি শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল এবং সমৃদ্ধ দক্ষিণ এশিয়ার স্বপ্ন দেখি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আফগানিস্তানের বিনির্মাণ এবং ভবিষ্যতের গতিপথ নির্ধারণ আফগানিস্তানের জনগণের ওপরই নির্ভর করে। আফগানিস্তানের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশটির জনগণ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করে যেতে বাংলাদেশ সদা প্রস্তুত।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শান্তি। 'শান্তির সংস্কৃতি' প্রস্তাবনার প্রধান প্রবক্তা হিসেবে আমরা শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস উগ্রবাদের করাল থাবায় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই আমরা সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতার বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স নীতি' বজায় রেখেছি। শীর্ষস্থানীয় শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বৈশ্বিক শান্তিরক্ষায় অবদানের জন্য আজ আমরা গর্ববোধ করি। মহামারির নজিরবিহীন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বজুড়ে কঠিনতম পরিবেশে নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বজায় রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সংবিধানের আলোকে আমরা সর্বদা সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের অবিচল সমর্থক। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, পারমাণবিক ও অন্যান্য গণবিধ্বংসী অস্ত্রের সম্পূর্ণ নির্মূলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। এই প্রত্যয় থেকেই আমরা 'পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি' অনুস্বাক্ষর করেছি। এ বছরের শুরুতে চুক্তিটি কার্যকর হয়েছে।

মাননীয় সভাপতি,

কোভিড-১৯ মহামারি জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় কার্যকর বৈশ্বিক উদ্যোগের ঘাটতির বিষয়টিকে সামনে নিয়ে এসেছে। একইসঙ্গে এটি বৈশ্বিক সংহতি ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার উপরেও আলোকপাত করেছে।

সর্বজনীন বিষয়গুলোতে আমাদের অবশ্যই একসঙ্গে কাজ করতে হবে। নতুন নতুন অংশীদারিত্ব ও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে বিভিন্ন অঞ্চলের সদস্য দেশগুলো এই জাতিসংঘের মঞ্চ থেকেই তা শুরু করতে পারে। তবেই আমরা সহনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উত্তরণের লক্ষ্যে একটি অর্থবহ সহযোগিতা অর্জন করতে পারবো।

এই ক্রান্তিলগ্নে জাতিসংঘই হোক আমাদের ভরসার সর্বোত্তম কেন্দ্রস্থল। আসুন, সেই ভরসাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রত্যয়ে আমরা সবাই হাতে হাত মিলিয়ে একযোগে কাজ করি।

শেষ করার আগে, সারা বিশ্বে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এই মহান সংস্থার সামনে বিগত প্রায় ৪৬ বছর আগে আমার পরিবারের সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যার ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রত্যাশার কথা তুলে ধরতে চাই। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোরে একদল বিপথগামী ঘাতক আমার পিতা, বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আমার স্নেহময়ী মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন ভাই মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ জামাল, ১০ বছরের শেখ রাসেল, চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসেরসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্য ও নিকটাত্মীয়কে নির্মমভাবে হত্যা করে।

আমি ও আমার ছোটোবোন শেখ রেহানা সে সময় বিদেশে অবস্থান করায় বেঁচে যাই। আমাদের ৬ বছর দেশে ফিরতে দেওয়া হয়নি। স্বজন হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে বিদেশের মাটিতে নির্বাসিত জীবন কাটিয়েছি। দেশে ফিরে আমি মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম শুরু করি। জাতির পিতার স্বপ্ন সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যে আজও আমি কাজ করে যাচ্ছি। যতদিন বেঁচে থাকবো, মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাব, ইনশাআল্লাহ।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ রাসেল দিবস

আবেগ ও স্মৃতিমাখা একটি স্মরণীয় দিন

খালেক বিন জয়েনউদদীন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ সন্তানটির নাম শেখ রাসেল। ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর ঢাকার বত্রিশ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর ধানমন্ডির তাঁর বড়ো আপা শেখ হাসিনার কক্ষে জন্মগ্রহণ করে এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মা-বাবা, ভাই-ভাবি ও স্বজনদের সাথে ঘাতকচক্রের হাতে শাহাদতবরণ করে। দীর্ঘ ৪৬ বছর পর গত ২৩শে আগস্ট মন্ত্রিপরিষদের এক সভায় রাসেলের জন্মদিনটি 'রাসেল দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শেখ রাসেলের জন্মদিনটি আমাদের কাছে আবেগমথিত একটি স্মৃতিমাখা দিন। কারণ এ দিনটিতে আমরা তাকে স্মরণ করতে গেলেই একটি বেদনাবিধুর অপমৃত্যুর ছবি আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আমাদের ছিল দুঃসময়। এসময় যথাযথভাবে কথা বলতে পারতাম না। আমাদের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে রাখা হয়েছিল। ১৯৮১-তে শেখ হাসিনা সেই নিষিদ্ধকালে স্বদেশে ফেরায় আমাদের রুদ্ধ দুয়ার খুলতে শুরু করে ছিয়ানব্বই সালে সকল বাধাবিপত্তি কাটিয়ে আমরা ঘুরে দাঁড়াই। স্বমহিমায় আবির্ভূত হন বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুর স্বজনেরা। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের মূল অবকাঠামোগুলো।

শেখ রাসেল বঙ্গবন্ধুর সন্তান হলেও পঁচাত্তরের পরে নির্যাতিত নিপীড়িত শিশুদের প্রতিনিধির প্রতীকে পরিণত হয়। গত একুশ বছর আমরা তাকে অধিকারহারা শিশুদের প্রতীক হিসেবে স্মরণ করেছি। তখন থেকে তার জন্মদিনটি জাতীয়ভাবে বিশ্ব শিশু দিবসের মাসে উদ্‌যাপিত হচ্ছে, এটা আমাদের কাছে যেমন আনন্দের, তেমনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতিও বটে। দেরিতে হলেও এই রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত তাৎপর্যবহ এবং ঐতিহাসিক, যা গোটা দেশবাসীর রাসেলের প্রতি ভালোবাসার ইচ্ছেপূরণ।

রাসেলের বড়ো আপার নাম শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা আদরের ছোটো ভাইকে হারিয়ে 'আমাদের ছোট রাসেল সোনা' শীর্ষক রচনায় রাসেলের জন্মক্ষণের কথা এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি লিখেছেন:

> ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর রাসেলের জন্ম হয় ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাসায় আমার শোবার ঘরে। দোতলার কাজ তখনও শেষ হয়নি। বলতে গেলে মা একখানা করে ঘর তৈরি করিয়েছেন। একটু একটু করেই বাড়ির কাজ চলছে। নিচতলায় আমরা থাকি। উত্তর-পূর্বদিকের ঘরটা আমার ও কামালের। সেই ঘরেই রাসেল জন্ম নিল রাত দেড়টায়। আব্বা নির্বাচনি মিটিং করতে চট্টগ্রাম গেছেন। ফাতেমা জিন্নাহ প্রেসিডেন্ট প্রার্থী। সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে একটা মোর্চা করে নির্বাচনে নেমেছে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সকল রাজনৈতিক দল। তখনকার দিনে মোবাইল ফোন ছিল না। ল্যান্ডফোনই ভরসা। রাতেই যাতে আব্বার কাছে খবর যায়, সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাসেলের জন্মের আগের মুহূর্তগুলো ছিল ভীষণ উৎকণ্ঠার। আমি, কামাল, জামাল, রেহানা ও খোকা কাকা বাসায়। বড়ফুফু ও মেজফুফু মা'র সাথে। একজন ডাক্তার ও নার্সও এসেছেন। সময় যেন আর কাটে না। জামাল আর রেহানা কিছুক্ষণ ঘুমায় আবার জেগে ওঠে। আমরাও ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে জেগে আছি নতুন অতিথির আগমনবার্তা শোনার অপেক্ষায়।
>
> মেজফুফু ঘর থেকে বের হয়ে এসে খবর দিলেন আমাদের ভাই হয়েছে। খুশিতে আমরা আত্মহারা। কতক্ষণে দেখব। ফুফু বললেন তিনি ডাকবেন। কিছুক্ষণ পর ডাক এল। বড়ফুফু আমার কোলে তুলে দিলেন রাসেলকে। মাথাভরা ঘন কালো চুল। তুলতুলে নরম গাল। বেশ বড়সড় হয়েছিল রাসেল। মাথার চুল একটু ভেজা মনে হলো। আমি আমার ওড়না দিয়েই মুছতে শুরু করলাম। তারপরই একটা চিরুনি নিলাম মাথার চুল আঁচড়াতে। মেজফুফু নিষেধ করলেন, মাথার চামড়া খুব নরম তাই এখনই চিরুনি দেয়া যাবে না। হাতে আঙুল বুলিয়ে সিঁথি করে দিতে চেষ্টা করলাম।

১৯৬৪ সালে জন্ম নেওয়া শেখ রাসেল ছয় দফা, ১৯৬৯'র গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১'র অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের আবহে বড়ো হয়েছে। বাল্যবেলায় তার গণ্ডি ছিল সীমিত। ধানমন্ডির বাড়ি, বিদ্যাপীঠ, ঢাকার স্বজনদের বাসা, টুঙ্গিপাড়া গ্রামের বাড়ি এবং একাত্তরে ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কের বাসায় মায়ের সাথে বন্দি জীবনযাপন করেছে।

একাত্তরে দেশ পাকিস্তানি ও রাজাকার মুক্ত হলে বাবার সাথে দু-একবার বিদেশে গেছে। তার বন্ধুর সংখ্যাও ছিল কম। পাশের বাড়ির ইমরান, আদিল ও ফুপাতো ভাই আরিফের সঙ্গে খুব ভাব ছিল। ট্রাই সাইকেল ভালোবাসতো রাসেল। বাড়িতে পোষা কবুতর তার প্রিয় ছিল। নিজে খাবার দিত। গৃহপরিচারিকা আম্বিয়াকে পছন্দ করত। প্রাক্তন মন্ত্রী ফণীভূষণ মজুমদারের ভাইঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী গীতালী দাশগুপ্ত ছিল তার গৃহশিক্ষক। গীতালীকে ভীষণ ভালোবাসতো। মৃত্যুর আগের দিনও তার কাছে

পাঠ নিয়েছে। পড়াশোনা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি স্কুলে। তার নাম ছিল শেখ রিসালউদ্দিন। এটিই তার প্রকৃত নাম। রাসেল তার ডাক নাম। বঙ্গবন্ধু বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের কথা মনে রেখে শিশুপুত্রটির নাম নির্ধারণ করেন।

রাসেল বেঁচেছিল দশ বছর। সে ছিল অবোধ, অবুঝ ও নিষ্পাপ। রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম নিয়ে বাড়িতে লোকজনের আনাগোনাই দেখেছে। তার মৃত্যু অস্বাভাবিক ও অপমৃত্যু হলেও সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। ১৫ই আগস্ট খুনিরা প্রথমে তাকে উপর থেকে নিচে নামিয়ে আনে চাচা নাসিরের সাথে পরে খুনি বজলুল হুদা ও নূর বাবা ভাইয়ের লাশের উপর দিয়ে নিয়ে মায়ের লাশের কাছে দাঁড় করিয়ে হত্যা করে। এই শিশু হত্যার দৃশ্য ভাবা যায় না। কোনো সভ্য মানুষ ভাবতে পারে না। খুনি জিয়া ও মোশতাকের লেলানো খুনিরা ছিল মানুষরূপী জানোয়ার।

খুনিরা শুধু ঐ দিন রাসলকে হত্যা করেনি। তারা মন্ত্রিপাড়ায় ফুপা আবদুর রব সেরনিয়াবাতসহ ফুপাতো ভাই আরিফ, বোন বেবী ও ফুপাতো ভাইপো সুকান্ত এবং মোহাম্মদপুরে শিশু নাসিমাকে হত্যা করে। শেখ ফজলুল হক মণির বাসায় তাঁর দুই শিশুপুত্র পরশ ও তাপস খাটের তলায় পালিয়ে বেঁচে যায়।

এ বছর ১৮ই অক্টোবর রাসেল দিবস পালিত হলো ভিন্ন পরিবেশে। তবে বিগত বছরগুলোয় বিশ্ব শিশু দিবসের প্রাক্কালে রাসেলের জন্মদিন নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত বছরগুলোতে রাসেলকে নিয়ে অজস্র গ্রন্থ রচনা হয়েছে। তার নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন। তৈরি করা হয়েছে টেলিফিল্ম *শেখ রাসেল এক ফুলকুঁড়ি*। এটির কাহিনি, সংলাপ ও চিত্রনাট্য পরিচালনা করেন বিটিভি'র প্রাক্তন উপমহাপরিচালক বাহারউদ্দিন খেলন। বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা হয়েছে শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও মিজানুর রহমান মিজান রচিত বই থেকে। হৃদয়বিদারক জীবনভিত্তিক এই ছায়াচিত্রে রাসেল চরিত্রে অপূর্ব অভিনয় করে শিশুশিল্পী আরিয়ান। আর মূলচরিত্র গৃহপরিচারিকা আম্বিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করেন প্রখ্যাত অভিনেত্রী রোকেয়া প্রাচী। রাসেলকে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একটি ঐতিহাসিক অ্যালবাম।

রাসেলের বাবার নাম শেখ মুজিবুর রহমান। মায়ের নাম বেগম ফজিলাতুন নেছা রেণু। ভাইবোনদের নাম– শেখ হাসিনা, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রেহানা ও চাচার নাম শেখ নাসের। দাদার নাম শেখ লুৎফর রহমান, দাদির নাম সায়েরা খাতুন, নানার নাম শেখ জহিরুল হক ও নানির নাম হোসনে আরা। তাদের গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলাধীন টুঙ্গিপাড়ার শেখ বাড়িতে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তাকে ঢাকার বনানীতে অন্যদের সাথে গোসল ও জানাজা ছাড়া গর্ত করে মাটি চাপা দিয়ে কবরস্থ করা হয়। রাসেল সেখানে মা, ভাই

ভাবি, চাচা ও স্বজনদের সাথে শুয়ে আছে। তাঁদের সমাধি ক্ষেত্র এখন তীর্থস্থান।

আমাদের প্রখ্যাত ছড়া-লেখক সুকুমার বড়ুয়া লিখেছেন–

অতি লোভী নরপশু বন্দুকবাজরা
রাসেলের কচিবুক করে দিল ঝাঁঝরা
দিন যায় দিন আসে, ইতিহাস ডাকবেই
একজন কোটি হয়ে, রাসেলেরা জাগবেই।

হ্যাঁ, রাসেল জেগেই আছে কোটি প্রাণ শিশু-কিশোরদের হৃদয়ে। রাসেল অধিকারহারা নিগৃহীত শিশুদের প্রতীক প্রতিনিধি। মনুষ্যসৃষ্ট দুর্বিপাকে এবং যুদ্ধে– বিশেষ করে আমাদের একাত্তরের মহাসমরে যে সকল অসহায় মা-বোন ও শিশু-কিশোরদের হত্যা করা হয়েছে তাদেরই একজন রাসেল। শিশুরা স্বর্গের দেবদূত এবং বাগানের ফুটন্ত গোলাপ, যা কখনো ঝরে পড়ে না। শিশুরা আনন্দ উৎসবের প্রজাপতি, আমাদের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার উত্তরসূরি। রাসেলও ছিল তাই। ১৮ই অক্টোবরে তার জন্মদিবসটি সে কথাই আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবে। রাসেলরা অমর।

খালেক বিন জয়েনউদদীন: বাংলাদেশ বেতারের প্রাক্তন স্ক্রিপ্ট রাইটার, সাহিত্যিক ও বাংলা একাডেমির ফেলো

সম্মানের সঙ্গে প্রবীণদের সেবা দিন নিজের স্বস্তিময় বার্ধক্যের প্রস্তুতি নিন

প্রফেসর ড. এ এস এম আতীকুর রহমান

বয়স বাড়ছে আর আমরা দ্রুতগতিতে বার্ধক্যের পানে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা কেউই বুড়ো হতে চাই না, শৈশবে ফিরে যেতে চাই! কিন্তু তাতো হওয়ার নয়। বেঁচে থাকলে বার্ধক্য অবশ্যম্ভাবী ও অলঙ্ঘনীয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং আর্থসামাজিক প্রভূত উন্নয়নের ফলে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বেড়েছে এবং ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এ দেশে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল এখন ৭৩ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তির কামনায় আর শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রার্থনায় থাকে দীর্ঘায়ু লাভ করা। বাস্তবিকতা হচ্ছে, বার্ধক্যে ব্যক্তির জীবন চলা খুবই বিড়ম্বনাময়, যন্ত্রণাদায়ক ও বিষম ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ করে ৮০ বছর বয়সের পর অতি-প্রবীণজনের শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, পারিবারিক, সামাজিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংকট, সীমাবদ্ধতা এবং ভোগান্তি চরমে গিয়ে পৌঁছায়। উপরন্তু এরা যদি হন নারী, প্রতিবন্ধী, সন্তান ও স্বজনহীন, তাহলে তো কথাই নেই। বৈশ্বিক অতিমারি কোভিড-১৯ বা করোনার ছোবলে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি ভুগেছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন প্রবীণজনেরাই। কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, বার্ধক্যে ব্যক্তির শারীরিক সক্ষমতা যেমন দুর্বলতর হতে থাকে এবং এসময়েই ওতপেতে থাকা সব রোগব্যাধি হামলে পড়ে জরাগ্রস্ত ঐ দুর্বল দেহটির ওপর।

প্রবীণত্ব বা বার্ধক্য কী এবং প্রবীণইবা কারা তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মত আর নানা যুক্তি থাকলেও বর্তমানে কেবল বয়সের নিক্তিতে ব্যক্তিকে প্রবীণজন বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে দুনিয়াজুড়ে। জাতিসংঘের বিবেচনায়, উন্নত দেশে ৬৫ বছর এবং উন্নয়নশীল দেশে ৬০ বছর হচ্ছে এর মাপকাঠি। কঠিন বাস্তবতা হচ্ছে, যারা প্রান্তিক, দরিদ্র, গ্রামীণ, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এবং অনুন্নত সমাজে বাস করেন, তাদের বার্ধক্য কিন্তু পঞ্চাশ বছর বয়সেই হানা দেয়! এসব সমাজের নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বার্ধক্যকাল আরও দুর্বিষহ, লাঞ্ছনাময় ও সংকটাপন্ন। বিশ্ব প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য হচ্ছে বৈচিত্র্য– প্রতিক্ষেত্রে প্রতিমুহূর্তে। তবে নিজেদের একান্ত স্বার্থে পৃথিবী-প্রকৃতির স্বাভাবিক বৈচিত্র্যকে অদূরদর্শী মানুষ করে তুলেছে বহুমাত্রিকভাবে চরম প্রভেদপূর্ণ। ফলে মানবসমাজে দেখা দিয়েছে নানা ধরনের অসাম্য, অবিচার, অনাচার, দুর্দশা আর দুর্ভোগ; জন্ম নিয়েছে লিঙ্গ বৈষম্য, বর্ণ বৈষম্য, শ্রেণি বৈষম্য, ধর্ম বৈষম্য, ভাষা বৈষম্য, বৃত্তি ও বিত্ত বৈষম্য ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে সম্প্রতি সমাজ জীবনে সবচেয়ে তীব্রভাবে আঘাত হেনে যাচ্ছে বয়স বৈষম্য (Ageism)। কেবলমাত্র বয়সের অজুহাতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অবমূল্যায়ন করাই হলো বয়স বৈষম্য; যার বড়ো শিকার হচ্ছেন আমাদের প্রবীণজনেরা।

বাংলাদেশের জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ অনুসারে বয়স ৬০ বছর হলে ঐ ব্যক্তিকে প্রবীণ (মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঘোষণা অনুযায়ী সিনিয়র সিটিজেন) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জনবিজ্ঞানীদের হিসাবে, বিশ্বব্যাপী প্রবীণদের সংখ্যা দ্রুতহারে বাড়ছে। ১৯৯৫ সালের ৫৪ কোটি বিশ্বের প্রবীণ জনসংখ্যা ২০২৫ সালে গিয়ে হবে ১২০ কোটি আর ২০৫০ সালে প্রায় ২০০ কোটি! বর্তমানে বাংলাদেশে প্রবীণদের সংখ্যা প্রায় ১.৪০ কোটি। ২০২৫, ২০৫০ এবং ২০৬১ সালে এদের সংখ্যা বেড়ে হবে যথাক্রমে প্রায় ২ কোটি, ৪.৫ কোটি এবং ৫.৫ কোটি। ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে শিশুদের চেয়ে প্রবীণদের সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে। স্থূলভাবে এ দেশের প্রবীণজনেরা তিন ধরনের। তরুণ-প্রবীণ (৬০-৭০ বছর), মধ্যম-প্রবীণ (৭০-৮০ বছর) এবং অতি-প্রবীণ (৮০+ বছর বয়সি)। ভীষণ উদ্বেগের বিষয় হলো, বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী অতি-প্রবীণদের বৃদ্ধিহার সবচেয়ে দ্রুত। সাধারণভাবে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর প্রধান চাহিদা হচ্ছে চিকিৎসা সেবা, আর্থিক সহায়তা এবং সন্তান-স্বজনের সাহচর্য। এক্ষেত্রে তরুণ-প্রবীণদের অন্যতম চাহিদা হচ্ছে পুনঃকর্মসংস্থান এবং অতি-প্রবীণদের একান্ত প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি যত্ন (Long term Care) এবং যাতনা প্রশমন সেবা (Palliative Care)। দেশের সকল শ্রেণির প্রবীণের জন্যে অবিলম্বে চালু করা দরকার সর্বজনীন সামাজিক পেনশন (Universal Social Pension) ব্যবস্থা এবং সকল নাগরিকের জন্যে বার্ধক্য বিমা (Old age Insurance) কর্মসূচি।

বার্ধক্য হচ্ছে ব্যক্তির একান্ত সমস্যা, যা মোকাবিলায় ব্যক্তিকেই মূল ভূমিকা নিতে হয় বা নেওয়া উচিত। জাতিসংঘ বলছে যে, বার্ধক্য হচ্ছে ব্যক্তির জীবনভর প্রস্তুতির বিষয়; আন্তঃপ্রজন্ম সংহতির ব্যাপার। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী বার্ধক্যের ধাক্কা মোকাবিলায় ন্যূনতম চিন্তাভাবনা, প্রস্তুতি ও বন্দোবস্ত আমাদের মাঝে নেই বললেই চলে। বরঞ্চ আছে কিছু বিভ্রান্তি, অবিবেচক জীবনাচরণ, অদূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি এবং যান্ত্রিক ও ভোগবাদী মানসিকতা। ভেজাল-অনিরাপদ খাদ্য ও ওষুধ গ্রহণ, রাত জাগা, শারীরিক পরিশ্রম বিমুখ হওয়া, মানসিক চাপে থাকা, ইতিবাচক ও সৃজনশীল চিন্তা ও কাজ না করা, দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন সুস্থ না রাখা ইত্যাদি আচরণের যোজিত ফল বার্ধক্যে পৌঁছে ব্যক্তি চরমভাবে দুর্ভোগ ভোগ করেন। সফল বার্ধক্য প্রতিষ্ঠায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ২০২০-২০৩০ সালকে স্বস্তিময় বার্ধক্য দশক (Decade of Healthy Ageing) ঘোষণা করেছে। দশকের মূল অভিযাত্রা হচ্ছে, প্রবীণজনের ভেতরের শক্তি-সামর্থ্য যেমন সজীব-সচল রাখতে হবে তেমনি সমাজ-সংসার-রাষ্ট্র-বিশ্বের পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাদের জন্যে সহায়ক করে তুলতে হবে। বিধ্বংসী প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে আমরা সদাসর্বদা ভূমিকম্পের (Earthquake) আতঙ্কে থাকি; কিন্তু মানবজাতির সামনে আরও ভয়ংকর মূর্তি নিয়ে ধেয়ে আসছে মানবসৃষ্ট দুর্যোগ– বার্ধক্যকম্প (Agequake)! বয়স ৭০-৮০ বছর হলে আপনি কোথায়, কীভাবে, কার সঙ্গে, কোন অবস্থায় থাকবেন তা কি চিন্তা করেছেন? সময় কিন্তু খুব বেশি একটা নেই! তাই সম্মানের সঙ্গে প্রবীণদের দেখভাল করুন, নিজের বার্ধক্য মোকাবিলার কার্যকরী প্রস্তুতি নিন এবং সন্তানদেরকেও তা শেখান। আজকের নবীনই আগামীর প্রবীণ। আবার প্রবীণের যুক্তি আর নবীনের শক্তি, দুইয়ে মিলেই সমাজের মুক্তি। বার্ধক্য জীবনের অভিনব এবং অনাকাঙ্ক্ষিত শেষ অবস্থা।

এর নানামুখী নিপীড়ন, যাতনা, বিড়ম্বনা, প্রবঞ্চনা, দুঃখকষ্ট কেবল প্রবীণজনেরাই হাড়ে হাড়ে টের পান। বিজ্ঞানীদের মতে, বার্ধক্য হচ্ছে উন্নয়নের উপজাত (Population ageing is a by-product of development)। তাই যে সমাজ যত উন্নত, বার্ধক্যের আকার, আকৃতি এবং জটিলতা, বিড়ম্বনাও সেখানে তত উৎকট।

বাংলাদেশের প্রচলিত কৃষ্টি অনুসারে প্রবীণ পিতামাতার শেষ বয়স পরিবারের সেবাযত্নে অতিবাহিত হওয়ার কথা। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের দীক্ষায় পরিবার কাঠামোতে এসেছে বিরাট পরিবর্তন। একটি বা দুটি সন্তান নিয়ে একক পরিবার এখন শহর-গ্রাম সবখানে। সন্তানেরা উচ্চশিক্ষিত হচ্ছে, নারীর কর্মসংস্থান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামর্থ্যবান সন্তানেরা পেশাগত কারণে দূরে-বহুদূরে বিদেশে চলে যাচ্ছে। ফলে পিতামাতা আর বয়স্করা ক্রমেই একাকী হয়ে পড়ছেন। বার্ধক্যে পৌঁছে সন্তানসন্ততি এবং নাতিনাতনিদের নিয়ে একত্রে বসবাস করা যেন সম্ভব হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বিভিন্ন প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিকজন অংশের কল্যাণের বিষয়টি অনেক বেগবান করেছেন। বার্ধক্যে পৌঁছে অনেকের মধ্যে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। সংগত প্রয়োজনে প্রতিবন্ধী প্রবীণদের দেখভাল এবং সুরক্ষার কথা জোরেশোরে উচ্চারণ করতে হবে। সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে কাউকেই উপেক্ষা করা যাবে না, অধিকার বঞ্চিত করে রাখা যাবে না। অন্যকে পেছনে ফেলে নিজেদের সর্বনাশ করা সমীচীন হবে না।

বয়স ৫০ বছর পার হলেই প্রত্যেককে তার নিজের সমাসন্ন বার্ধক্যের প্রস্তুতি নিতে শুরু করতে হবে। স্বাধীন এবং স্বনির্ভর (Independent and Self-dependent) বার্ধক্য অতিবাহিত করার চিন্তা করুন। নিজের/নিজেদের রান্নাবান্না, কাপড়চোপড় ও ঘরদোর পরিষ্কার, বাজার করা, ব্যাংক থেকে টাকা লেনদেন, বিভিন্ন বিল জমাদান, হাসপাতাল/ডাক্তারের কাছে যাওয়া-আসা ইত্যাদি সব কাজ নিজে করার অভ্যাস করুন। বাস্তবতার প্রয়োজনে এডাল্ট ডায়াপার ব্যবহারের প্রস্তুতি নিন। শেষ বয়সে আপনাকে সাহায্য করার জন্যে হাতের কাছে কাউকেই পাবেন না। সময় থাকতে নিজের শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, আর্থিক, দালিলিক, পেশাগত, সম্পত্তিগত, ব্যাংক-বিমা-সঞ্চয়-ঋণ ইত্যাদি বিষয়গুলো দূরদৃষ্টি নিয়ে গুছিয়ে আনুন। পুরুষ বা স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে নিজের পাশাপাশি তার স্ত্রীর যাবতীয় নিরাপত্তার শক্ত ব্যবস্থা করে রাখা। কেননা স্বামীর তুলনায় এ সমাজে স্ত্রীর গড় বয়স বেশি। শেষ বয়সে নারীর বিধবা হয়ে বেঁচে থাকার ঝুঁকি থাকে। মুসলিম পরিবারে স্ত্রীর প্রাপ্য দেনমোহর এবং উত্তরাধিকার সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা স্বামীকেই করে রাখতে হবে। আবার যুব বয়স হতে নারীকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সঞ্চয়ের উদ্যোগ নিতে হবে। বার্ধক্য মোকাবিলায় এই অর্থ তাকে স্বাবলম্বী এবং ক্ষমতাবান করে রাখবে। মানুষের প্রবীণকাল খুবই সংবেদনশীল ও সংকটাপন্ন থাকে। আবেগীয় সেবা নয়, এসময়ে তাদের দারুণভাবে প্রয়োজন পেশাগত সেবা। ডাক্তার, ডেন্টিস্ট, সাইকোলজিস্ট, নার্স, থেরাপিস্ট, সমাজকর্মী প্রমুখের দেওয়া সেবাই এখানে মুখ্য। নার্সিং হোম বা পূর্ণাঙ্গ প্রবীণ নিবাস এক্ষেত্রে তার উপযুক্ত স্থান। একুশ শতকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষিত, সচ্ছল এবং উচ্চবিত্তের নাগরিক বার্ধক্যে উপনীত হচ্ছেন ক্রমবর্ধমান হারে। কিন্তু এদের সন্তান সংখ্যা যেমন দুই-একজন, তারাও থাকে বিদেশে অথবা নিজ কর্মক্ষেত্রে অতীব ব্যস্ত! এই শ্রেণির প্রবীণদের জন্যে লাগসই হচ্ছে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ প্রবীণ নিবাস। সরকারসহ সকলকেই এ বিষয়ে বাস্তবমুখী হয়ে উদ্যোগী এবং সক্রিয় হতে হবে। এখানে এরা পাবেন সার্বক্ষণিক রুচিকর খাদ্য, আরামদায়ক শয্যা, দরকারি চিকিৎসা ও নার্সিং কেয়ার, শারীরিক ও অর্থগত নিরাপত্তা, ধর্মচর্চা ও বিনোদন সুবিধা এবং সর্বোপরি সমবয়স্ক মানুষের সাহচর্য।

দেশের বিপুল সংখ্যক প্রবীণদের অধিকারভিত্তিক সম্মানজনক কল্যাণ বিধানে প্রবীণদরদি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী উদ্যোগ, অর্জন, সাফল্য এবং সুনাম অত্যন্ত উজ্জ্বল। ১৯২৫ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত অবসরকালীন পেনশন ব্যবস্থার পর ১৯৯৭-১৯৯৮ সালে যুগান্তকারী বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন, জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ ও পিতামাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩ প্রণয়ন, অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধি, পেনশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, প্রবীণ হিতৈষী সংঘের স্বাস্থ্যসেবা-অনুদান বৃদ্ধিসহ প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ তাঁর দূরদৃষ্টি এবং মহানুভবতারই বহিঃপ্রকাশ। বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তিনি অভূতপূর্বভাবে সম্মানিত করে যাচ্ছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় সকলেই আজ প্রবীণ। বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতাহারে প্রবীণদের কল্যাণে যেসকল অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে, তা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক এবং ইতোমধ্যে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। নারীত্ব এবং বার্ধক্য বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের পথে, নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নয় বরঞ্চ অপূর্ব সুযোগ ও সহযোগী, একজন আলোকিত প্রবীণ নারী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যক্তিগতভাবে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। দেশের প্রবীণগোষ্ঠী তাই তাঁর কাছে যারপরনাই কৃতজ্ঞ।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বহুদিন ধরে প্রবীণদের কল্যাণে সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় কমিটি পরিচালনা, প্রাসঙ্গিক নীতি, আইন ও বিধিবিধান প্রণয়নে নেতৃত্বদান, বয়স্ক ভাতাসহ বিভিন্ন ভাতা বিতরণ, আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন, প্রবীণ সংশ্লিষ্ট এনজিওদের সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি দেশের প্রবীণজনের কল্যাণে কিছু মহৎপ্রাণ সমাজসেবীদের নিয়ে বরেণ্য চিকিৎসক অধ্যক্ষ ডা. এ কে এম আব্দুল ওয়াহেদ ১৯৬০ সালে গড়ে তোলেন প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান। প্রবীণদের চিকিৎসা সেবা পুষ্ট করায় স্বাস্থ্য

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ ১লা অক্টোবর ২০২১ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবছর বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘকে আর্থিক অনুদান প্রদান করে এবং ঢাকাসহ দেশব্যাপী সংঘের প্রায় ৮০টি শাখায় প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবায় এই অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, ডা. ওয়াহেদের মৃত্যুর পর ১৯৭১ সালে সংঘের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নির্দেশনায় ১৯৭৩ সালে সংঘটি পুনর্জীবন লাভ করে এবং আজ অবধি অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে প্রবীণদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে ২০১৪ সাল থেকে চালু রয়েছে 'বার্ধক্য ও প্রবীণ কল্যাণ' (Gerontology and Geriatric Welfare) বিষয়ক একটি স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম। ডাক্তার, নার্স, থেরাপিস্ট, সমাজকর্মী, মনোবিজ্ঞানী ইত্যাদি পেশাজীবীরা এই কোর্স সম্পন্ন করছেন। আশা করা যায়, আগামীতে এরাই দেশের প্রবীণদের পেশাগত সেবায় লাগসই ভূমিকা পালন করতে পারবে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদ, জাতীয় সংসদ, রাজনীতি, শিক্ষাবিদ এবং পেশাজীবীদের বিরাট অংশই আজ আলোকিত প্রবীণদের কাতারে আছেন। এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তদের গড় বয়স ৬২ বছর এবং বিশ্বের বৃহত্তম ১০০টি প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্টদের গড় বয়স ৬৩ বছর। অর্থাৎ আজকের সমাজ-সংসার-সভ্যতা কিন্তু প্রবীণদেরই হাতে গড়া, তারাই এর সুনিপুণ কারিগর। এতৎসত্ত্বেও, প্রবীণ বয়সের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আক্ষেপ করে লিখেছেন, 'পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে আধেক আঁখির কোণে, অলস অন্য মনে'! প্রাপ্য অধিকার এবং ন্যায্য সম্মানের ভিত্তিতে প্রবীণজনেরা অনিন্দ্য সুন্দর এই বাংলাদেশে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে বয়স-সমতার সৌন্দর্যে বসবাস করতে চান। সংগত কারণে, আজকে আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব-কর্তব্য হচ্ছে উপস্থিত প্রবীণদেরকে সম্মানের সঙ্গে দেখভাল করা এবং নিজেদের সমাগত বার্ধক্যের কার্যকরী ও সফল প্রস্তুতি নেওয়া।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এবার ১লা অক্টোবর জাতিসংঘ ঘোষিত ৩১তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস (International Day of Older Persons) পালন করা হয়েছে। জাতিসংঘ দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে– Digital Equity for All Ages বা ডিজিটাল সমতা সব বয়সের প্রাপ্যতা। দেশ, সমাজ, অঞ্চল তথা গোটা বিশ্বে প্রবীণজনসহ সব বয়সি নাগরিকের জন্যে ডিজিটাল সুবিধা সমান অভিগম্য এবং উপযোগী করে রাখার জন্যে জাতিসংঘের এই উদাত্ত আহ্বান। এসডিজি'র মূল অঙ্গীকারের আলোকে বয়সের অসাম্য গুড়িয়ে দিয়ে ন্যায্য অধিকার আর মর্যাদার ভিত্তিতে সমাজ-সংসারে নাগরিক হিসেবে সকলকে ডিজিটাল তথা প্রযুক্তির সমান সুযোগ দিতে পারলে আসবে মানবজাতির ভারসাম্যময় উন্নয়ন এবং টেকসই কল্যাণ।

প্রবীণদরদি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে প্রবীণ-প্রবীণাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, অবিলম্বে বার্ধক্য এবং প্রবীণকল্যাণ বিষয়ক একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় অথবা অধিদপ্তর স্থাপন করুন; প্রণয়নাধীন প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন পাস করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করুন; অটিস্টিক প্রবীণ, প্রতিবন্ধী প্রবীণ, সমাজবিচ্ছিন্ন প্রবীণ, অতিপ্রবীণ এবং বিশেষ করে নারী প্রবীণদের জন্যে সুপরিকল্পিত, লাগসই, কার্যকরী ও দূরদর্শী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন; দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম নারী তার দেনমোহরের প্রাপ্য অর্থ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পদ/সম্পত্তি যেন সঠিকভাবে এবং যথাসময়ে হাতে পান সে লক্ষ্যে কার্যকরী রাষ্ট্রিক উদ্যোগ নিন; প্রতিটি হাসপাতাল ক্লিনিকে প্রবীণজনের কল্যাণে বিশেষ ওয়ার্ড এবং অতি প্রবীণ/শয্যাশায়ী প্রবীণদের জন্যে দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যসেবা, প্যালিয়েটিভ কেয়ার, হসপিস কেয়ার, রেসপাইট কেয়ার ইত্যাদির আয়োজন করুন। এতে করে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ আর পিতামাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করা সহজতর হবে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় আমরা আরও বহুদূর এগিয়ে যাব। আসুন, সম্মানের সঙ্গে প্রবীণজনের দেখভাল-সেবাযত্ন করি এবং দূরদর্শী হয়ে নিজেদের সফল ও স্বস্তিময় বার্ধক্যের প্রস্তুতি নেই। সকলের বার্ধক্য সহনীয়, স্বস্তিময় ও আনন্দঘন হোক।

প্রফেসর ড. এ এস এম আতীকুর রহমান: অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সভাপতি, বাংলাদেশ জেরোন্টলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, atiqrdu@gmail.com

শুদ্ধাচারের সকল রীতি
দেশ গড়ার মূলনীতি

সোনার বাংলা গঠনে বঙ্গবন্ধুকন্যা

প্রফেসর ড. প্রিয়ব্রত পাল

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৫২, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯, ১৯৭০-১৯৭১ সালের এই দেশের মানুষের সুদীর্ঘ সংগ্রাম, আন্দোলন ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ফল। বঙ্গবন্ধুকে সর্বমোট ৪৬৮২ দিন বিভিন্ন সময়ে জেলে থাকতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭১ সালে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম– সেই মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহিদের রক্ত, দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানিসহ মানবিক ও ভৌত অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছিলাম স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি দেশে ফিরে দায়িত্ব গ্রহণ করেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনে মনোযোগ দেন, তখন রাস্তাঘাট, ব্রিজ সব ছিল বিধ্বস্ত। চট্টগ্রামে নৌবন্দরে মাইন পোতানো ছিল, যা রাশিয়ার প্রচেষ্টায় মুক্ত করা হয়। অন্যদিকে ভারত থেকে ফিরে আসা এক কোটিরও বেশি শরণার্থী এবং পাকিস্তান থেকে ফেরা এবং এ দেশের জনগণের গৃহহীনদের যাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়েছিল পাকিস্তানি বর্বর সৈন্যরা, ৩০ লক্ষ শহিদ পরিবারের এবং দুই লক্ষ সম্ভ্রমহারা মা-বোনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ আজ যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে ক্রমধাবমান, বাংলাদেশ যতটা অর্জন করেছে– তার মূলভিত্তি রচনা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু মাত্র তিন বছর সাত মাস তিন দিনের শাসনামলে দেশ গড়ার বহুমুখী কর্মপরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই থেকে কার্যকর হয় ১৯৭৩-১৯৭৮ বছরের জন্য প্রণীত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ, বেকারদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি, কম মজুরিতে নিযুক্তদের মজুরি বৃদ্ধি, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সমতাভিত্তিক আইন ব্যবস্থাসহ অর্থনৈতিক সংস্কার, বিশেষ করে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতির সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের মূলভিত্তি রচনা।

কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে সমতাভিত্তিক বণ্টনের মাধ্যমে মানব শক্তির উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সম্পদের স্থিতিশীল কাঠামো তৈরি করা, যাতে বিদ্যমান জিডিপি সন্তোষজনক অবস্থায় উন্নীত হয় এবং গণমানুষ এ অর্থনৈতিক সুবিধা সমানভাবে ভোগ করতে পারে। জিডিপি সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল– বিদ্যমান ৩ শতাংশ জিডিপি'কে ৫.৫ শতাংশে উন্নীত করা। জিডিপি বৃদ্ধির এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল মূলত কৃষি উন্নয়ন, ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে। দেশ গড়ার কাজে হাত দিয়ে তিনি প্রথমেই কৃষির ওপরই জোর দিয়েছিলেন। সেচপাম্প, সার, বীজ, কীটনাশক, কৃষিযন্ত্রপাতি ইত্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তারই প্রভাবে ১৯৭৪ সালে জিডিপি অর্জিত হয়েছিল ৯.৬ শতাংশ। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরবর্তী ২১ বছরে বাংলাদেশের জিডিপি'র ধারবাহিকতা বজায় থাকেনি। এ সময়ের মধ্যে জিডিপি কোনো কোনো বছর ২.১৩ শতাংশ (১৯৮২) থেকে ০.৮২ শতাংশ (১৯৮০)-এ নেমেছে।

১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী বড়ো শিল্প, ব্যাংক, বিমা এবং অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের একটি বড়ো অংশকে ২৬শে মার্চ ১৯৭২ তারিখের প্রেসিডেন্ট অর্ডার ২৭, ১৯৭২-এর আওতায় জাতীয়করণ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শিক্ষা ক্ষেত্রে সামগ্রিক অবকাঠামো গঠন হয়েছে। তিনি প্রাথমিক স্তরের ৩৬,০০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করেন– যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। অন্যদিকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭,০০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করেন। বছরের প্রথম দিনে সাড়ে ৪ কোটি শিক্ষার্থীর হাতে পাঠ্যবই বিতরণ করেন, এটাও একটি সাহসী পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত অল্প সময়ে মাত্র ১০ মাসে জাতিকে একটি কার্যকর সংবিধান উপহার দিয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা, ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করা, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩ সালের আইন প্রণয়ন এবং এ আইন বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠন– এসব বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে হয়েছিল।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রায় বিশ শতাংশের বয়স ২৪ বছরের নিচে, প্রতিবছর বিশাল জনগোষ্ঠী চাকরির বাজারে প্রবেশ করছে। যদি আমরা এই তরুণদের মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে পারি তাহলে আমাদের আর পেছনে ফিরে তাকাতে হবে না। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়ন বরাদ্দ অনেক বেড়েছে। বিগত ১৫ বছরের ব্যবধানে দেশে এখন অর্ধশতাধিক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। শিক্ষা খাতে বাজেট আনুপাতিক হারে বেড়েছে। নতুন এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকাস হলো বিজ্ঞান

ও প্রযুক্তি। প্রযুক্তি ছাড়া কোনো দেশের জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব নয়। আশার কথা হলো– কৃষি, প্রযুক্তি, চিকিৎসা খাতে উচ্চশিক্ষায় দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এছাড়াও প্রায় ১০৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং কিছু অনুমতির অপেক্ষায় আছে।

সংবিধান অনুযায়ী জাতীয়করণের ফলে সরকারি মালিকানায় সমস্ত শিল্পকারখানা ১৯৭০ সালে যা ছিল ৩৪ শতাংশ, ১৯৭২ সালে হয়ে গেল ৯২ শতাংশ। অন্যদিকে বেসরকারি খাত ৬৬ শতাংশ থেকে নেমে এল ৮ শতাংশে।

গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো এক পরিবর্তন আনে। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো অবস্থানকারী মহাজন ফাঁদে ফেলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল। চক্রবৃদ্ধি আকারে ধার দেওয়া অর্থ দাবি করে কৃষক ও সাধারণ মানুষদের সর্বস্বান্ত করে দিত। বঙ্গবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত ৬টি সরকারি ব্যাংকসমূহ এবং কৃষি ব্যাংক বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ছড়িয়ে পড়ে সত্তর দশকে এবং প্রায় সাড়ে তিন হাজার বা তারও বেশি শাখা অফিস। গ্রামীণ জনপদ বা শহরে যে সঞ্চিত অর্থ থাকত বালিশের নিচে কিংবা মাটির ব্যাংকে তা উঠে এল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ভল্টে। ঋণ প্রবাহের মাধ্যমে এই টাকা এখন জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। অলসতা থেকে হাত বদল হচ্ছে এবং অপরদিকে অর্থনীতিকে করে তুলছে বেগবান। অন্যদিকে আমানতকারীদের টাকা রেখে নিরাপত্তা এবং মুনাফা দুটোই লাভ করছে। তার আয় বাড়ছে, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক অর্থনৈতিক ভিন্ন এক মাত্রা পাচ্ছে– যা পুরো অর্থনীতিকে বদলে দিয়েছে।

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন গ্রামীণ সমাজে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দেশের প্রতিটি গ্রামে গণমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হবে– যেখানে গরিব মানুষ যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিক হবেন, যেখানে গরিব মানুষকে শোষণ থেকে মুক্তি দেবে, যেখানে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা গরিবের শ্রমের ফসল লুট করতে পারবে না।

বঙ্গবন্ধু যেদিন দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা দিলেন তার সাড়ে চার মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো। এর কারণ বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচিতে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনসহ সুনির্দিষ্ট কর্মপ্রণালি বিবৃত করেছিলেন– যা দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা মেনে নিতে পারেনি।

প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা ও প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা–উত্তরকালে গণশিক্ষা প্রসার তথা নিরক্ষতা দূরীকরণের জন্য জরুরিভিত্তিতে আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। পল্লি উন্নয়ন ব্রিগেড গঠন করে ৬ মাসের মধ্যে এই অর্থ ব্যয় করে নিরক্ষতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। ১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে সরকার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের বেতন দিতে হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়। নারী শিক্ষা উন্নয়নের জন্য এটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল। তখন প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল ৭১৬৫ এবং তাতে শিক্ষক ছিলেন ১,৭০,৬৪৫ জন। কমিশন শিক্ষা খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করেন, মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগ। এই প্রস্তাব জাতিসংঘ প্রস্তাবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

বাংলাদেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪৯৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৯ শতাংশ সরকারি খাতে এবং ১১ শতাংশ বেসরকারি খাতে। কাজেই এ পরিকল্পনায় সরকারি খাতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সামনে রেখে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রের মূলনীতির ওপর। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব থেকে মুক্তি এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ের প্রেক্ষাপটের পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারিত হয়।

ড. কুদরত-ই-খুদা কমিশন যখন রিপোর্ট প্রস্তুত করে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তখন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন– 'আমার শিক্ষকরা যে রিপোর্ট তৈরি করে তা দেখা ও যাচাই করার দক্ষতা আমার নেই, আপনারা সিদ্ধান্ত নিয়ে যা তৈরি করেছেন তাই বাস্তবায়ন হবে।' এই হলো বঙ্গবন্ধু, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির অসাধারণ উক্তি। অন্যদিকে তাঁর আরও একটি উক্তি আছে 'একটি দেশকে ধ্বংস করার জন্য ভারী আগ্নেয়াস্ত্রের দরকার নেই, শিক্ষাব্যবস্থাকে নষ্ট করাই যথেষ্ট'।

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার পর বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পুনর্জীবন ঘটে। ফলে জীবনধারণের মান উন্নয়নে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে অদম্য শক্তি উৎপন্ন হয়। জনগণের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও সামাজিক উন্নয়ন নীতির সংমিশ্রণে তৈরি পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৯৭-২০০২ বাস্তবায়ন করে। এটি ছিল সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ সরকারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল থেকে মজবুত ভিত্তি করে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ পরিকল্পনা ১৯৯৮ সালে ভয়াবহ বন্যা সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও সরকার ৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন, বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির হার ৭.৫ শতাংশ বজায় রাখতে সমর্থ হয়। এই সংস্কারমূলক ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে যোগাযোগ, পরিবহণ, শিল্প নিয়ন্ত্রণ ও বৃহদায়তন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়।

২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বর্তমান পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং জিডিপির হারও ক্রমবর্ধমান। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল, স্বল্পোন্নত দেশের তকমা থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণ ঘটছে। বাংলাদেশ আজ পাতাল রেল, নদীর নিচে টানেল, গভীর সমুদ্রবন্দর, পারমাণবিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র, নিজস্ব টাকায় পদ্মা সেতুর মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

৬৫ লাখ ৯৫ হাজার ৬৮০ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয় ধরে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২০ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের জুন) চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আসবে ৮৮ দশমিক ৫ শতাংশ এবং বিদেশ থেকে আসবে ১১ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০২১-২০২৫ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে এক কোটি পাঁচ লক্ষ ৭০ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে, এর মধ্যে ২৫ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে প্রবাসে বাকি ৮০ লাখ ৭০ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে দেশে। দারিদ্র্যবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সুদক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ফলে অর্থবছর ২০০৯ এবং অর্থবছর ২০১৯ মধ্যবর্তী টানা দশ বছর বাংলাদেশে নির্বিঘ্ন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করে। এই সময়কালে মাথাপিছু আয় ৭৫৪ ইউএস ডলার থেকে বেড়ে ২০৬৪ ইউএস ডলারে উন্নীত হয়, গড় আয়ু ৬৫ বছর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩ বছরে উন্নীত হয়। বয়স্ক সাক্ষরতা ৫৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭৫ শতাংশ, দারিদ্র্য ৩৫ শতাংশ থেকে কমে ২০ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে আসে। ফলে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক সংজ্ঞায়িত নিম্ন আয়ের দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে এসে ২০২১ সালের আগেই ২০১৫ সালে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় স্থান পায়।

২০১৮ সালে বাংলাদেশে জাতিসংঘের সকল মানদণ্ড পূরণ করে স্বল্প উন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকাভুক্ত হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এটি নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশের জন্য অন্যতম উল্লেখযোগ্য অর্জন।

জনগণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর দল আওয়ামী লীগকে ২০১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তৃতীয়বারের মতো পুনর্নির্বাচন করে। তিনি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার এবং তাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এমন সময় হতে যাচ্ছে যখন জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করছে।

পঞ্চবার্ষিকী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্থনৈতিক রূপান্তর সম্পর্কিত বড়ো বড়ো উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সপ্তম পরিকল্পনার অগ্রগতি ইতিবাচক ছিল। কৃষিতে মূল্য সংযোজনের অবস্থান ২০১৫ অর্থবছরের ২৩ শতাংশ থেকে ২০১৯ অর্থবছরের ২৬ শতাংশে পৌঁছেছে, এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তা আরও জোরদার হয়েছে– যা শস্য উৎপাদন এবং জনগণের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট সহায়ক, অন্যদিকে সবজি ও ফল উৎপাদন বৃদ্ধিসহ প্রোটিনসমৃদ্ধ মাছ, ডিম ও দুধের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য পুষ্টি উন্নয়নে অবদান রাখছে।

অনলাইনে ক্লাসের জন্য সরকার ৫০,০০০ ছাত্রছাত্রীদের স্মার্ট ফোন বিনা সুদে কিনে দিয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের ইন্টারনেট সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, গ্রামীণ ইন্টারনেট সহজলভ্য করা হয়েছে, যেন গ্রামের গরিব ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ার সুযোগ পায়, অধিকন্তু বিশেষ টিভি চ্যানেলের মাধ্যমেও স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর বাস্তবায়ন ৫ বছর মেয়াদি ধাপে ধাপে করা হবে, প্রথম ধাপটি অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দিয়েই শুরু হয়েছে। তাই অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান কাজই হচ্ছে– প্রকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন এমনভাবে শুরু করা, যাতে বাংলাদেশ ২০৩০ অর্থবছরের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করার লক্ষ্যের কাছে পৌঁছাতে পারে, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে এবং চরম দারিদ্র্য দূর করতে সক্ষম হয়।

তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে মেনুফ্যাকচারিং এগিয়ে যাচ্ছে, এতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেড়েছে, রপ্তানি বেড়েছে এবং তৈরি পোশাক খাতে চার মিলিয়ন কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে তৈরি পোশাক খাত প্রধান ভূমিকা পালন করে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। শ্রমশক্তি উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং পুঁজি গঠন ও প্রযুক্তির ওপর। ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়নকৃত আইসিটি ব্যবহারের ফলে মোবাইলপ্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে নাগরিকের উৎপাদনশীলতা উন্নত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য দৌহিত্র, প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যপুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের নেতৃত্বে। ডিজিটাল বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় ১২ বছর আগে ডিজিটাল প্রকল্প গ্রহণের মধ্য দিয়ে। বর্তমানে ১৫ লক্ষ কর্মচারীর আইটি সেক্টরে কর্মসংস্থান হয়েছে। গ্রামে ৮ হাজার সেন্টারের মাধ্যমে ষোলো হাজার কর্মী ১৫০০ সেবা প্রদান করছে। বর্তমানে আইসিটি সেক্টরের মাধ্যমে এক বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় হচ্ছে। এছাড়াও বর্তমানে করোনাকালে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জরুরি সভা এবং কর্মকাণ্ড সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-এর সহায়তায় কাগজবিহীন ১১০০০ দপ্তর স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেড় কোটি ই-ফাইল সম্পাদন করা হয়েছে। এছাড়াও ডাটাসেন্টার ও সুরক্ষা প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে সাড়ে তিন কোটি মানুষ টিকা নিবন্ধন করেছেন এবং ২০১৭ সালে ৯৯৯ কল সেন্টারের মাধ্যমে সহজভাবে পুলিশি সেবা, ফায়ার সেবা, অ্যাম্বুলেন্স সেবা ২৪ ঘণ্টায় জনগণ বিনা বাধায় পাচ্ছেন। পরবর্তী বছর ২০১৮ সালে ৩৩৩ নম্বরের মাধ্যমে জনগণ স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য সহযোগিতা খাতে সহযোগিতা পেয়ে যাচ্ছেন– যেটা করোনাকালে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে মোবাইলের নেটওয়ার্কের আওতায় ১২ কোটি জনগণ সংযুক্ত হয়েছে। বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সহজে অনলাইনে ক্লাস করা সম্ভব হচ্ছে, দৈনন্দিন মন্ত্রণালয়ের সভাও ইন্টারনেটের মাধ্যমে অফিসে না গিয়ে বাসায় বসে সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে, যেটা খুবই উপযোগী এবং খুবই প্রয়োজন। ডিজিটাল অর্থনীতিতে ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে জনগণের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদি সমাধানে আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ইতোমধ্যে উদ্‌বোধন করা হয়েছে ব্রেজ সার্ভিস– যা বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, কিউ ক্যাশ-এর মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টায় লেনদেন করা সম্ভব হবে মাত্র ৫ সেকেন্ডের সময়ে, প্রবাসীরা সহজে রেমিটেন্স দেশে পাঠাতে পারবেন আবার ফ্রিল্যান্সার ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করেন তারাও উৎসাহিত বোধ করবেন সহজে অর্থপ্রাপ্তির মাধ্যমে।

তেলের মাধ্যমে চড়া মূল্যের বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিবর্তে কয়লা ব্যবহার করে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র মাতারবাড়িতে স্থাপিত হচ্ছে– যা ২০২৪ সালের মধ্যে সম্পাদিত হবে এবং এই প্রকল্পে ১৪টি দেশের সাত হাজার শ্রমিক কাজ করছে। এই প্রকল্পের কারণে এলাকার লবণ চাষিরা স্বাবলম্বী হয়েছে। তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ারসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বিভিন্ন দেশ থেকে জনগণের জন্য টিকা ক্রয় করে বিনামূল্যে টিকা প্রদান করছে, যা অতীব প্রশংসনীয়। এছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণির এবং পেশাজীবীদের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে যার ফলে রপ্তানি বাণিজ্য চলমান আছে। এ কারণে জাতিসংঘ থেকে এসডিজি বাস্তবায়নে সক্ষমতার কারণে প্রধানমন্ত্রী ক্রাউন জুয়েল বা মুকুটমণি উপাধি ও সম্মান পেয়েছেন। বিশ্বের দ্বিতীয় সফল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। তিনি মোট ১৭ বার জাতিসংঘ অধিবেশনে জাতির পক্ষ থেকে বক্তব্য রেখেছেন, যা অত্যন্ত গৌরবের।

বঙ্গবন্ধু দুঃখী মানুষের দুঃখ দূর করে সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। তাই বঙ্গবন্ধু শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন, শিক্ষকরা হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। যদি আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, তাহলে প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার সর্বক্ষেত্রে দরকার সৎ, যোগ্য ও দক্ষ কর্মী আর নেতৃত্ব দেওয়ার মতো অফিস-প্রধান। প্রয়োজন দেশের উন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ ও আপোশহীন কর্মকর্তা-কর্মচারীর আপ্রাণ প্রচেষ্টা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা। সর্বোপরি প্রয়োজন আইনের শাসন ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায় এবং জনগণের অংশগ্রহণে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রা অব্যাহত হোক– এই প্রত্যাশা করি নিরন্তর।

প্রফেসর ড. প্রিয়ব্রত পাল: অর্থনীতিবিদ এবং অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, prbrpal@gmail.com

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

শান্তির দূত
বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা

সৌরেন চক্রবর্ত্তী

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশের এক-দশমাংশ আয়তনজুড়ে তিনটি জেলা– রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা। এখানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির স্বকীয়তা বজায় রেখে দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর পার্বত্য অঞ্চল স্বাধীনতা পূর্বকালে যথেষ্ট পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত অবস্থায় ছিল। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বিভিন্ন বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল উন্নয়নের গতিধারায় যুক্ত হচ্ছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কুচক্রীদের হাতে বঙ্গবন্ধু স্বজনদের সঙ্গে নিহত হওয়ার পর ঐ অঞ্চলের বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত হয়। উন্নয়নের এ অচলাবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের কারণে প্রায় দীর্ঘ দুই যুগব্যাপী স্থায়ী হয়।

১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জয়ী হয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। বঙ্গবন্ধুকন্যা সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করে পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সেখানকার মানুষদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসেন। ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় সংসদে সরকার দলীয় চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে ১১ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করেন। একই বছর ডিসেম্বর মাসে খাগড়াছড়ির সার্কিট হাউসে জন সংহতি সমিতি (JSS) ও সরকারের মধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা অক্ষুণ্ন রেখে সংবিধানের আওতায় এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই জনগণের ন্যায়সংগত দাবিপূরণের সম্ভাব্য সর্বোত্তম সমাধান খুঁজতে উভয়পক্ষ ঐক্যমতে পৌঁছে। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের গুণে ও প্রচেষ্টায় জাতীয় কমিটি ও JSS-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত সপ্তম বৈঠকে চূড়ান্ত সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, ঊর্ধ্বতন সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিদেশি কূটনীতিকদের উপস্থিতিতে সরকারের পক্ষে জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জন সংহতি সমিতির পক্ষে JSS-এর সভাপতি ও শান্তিবাহিনীর প্রধান শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যেটাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বলা হয়ে থাকে। তৃতীয় কোনো দেশ বা পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই দীর্ঘ বিরাজমান সশস্ত্র বিদ্রোহের অবসান ও শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান অর্জিত হয়। এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ফলে। এ ঐতিহাসিক মুহূর্তে উপস্থিত থেকে তা দেখার বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

১৯৯৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে শান্তিবাহিনীর প্রথম দলটি সন্তু লারমার নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট অস্ত্রসমর্পণ করে। পর্যায়ক্রমে চার ধাপে অস্ত্রসমর্পণ প্রোগ্রাম হয়। সর্বশেষ দুদকছড়িতে শান্তিবাহিনী অস্ত্রসমর্পণ করে। যে অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিত থাকার স্মৃতি আজও মনে পড়ে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, ১৯৯৮ সালের ৬ই মে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন সংশোধন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন জাতীয় সংসদে পাস হয় এবং ১৯৯৮ সালের ১৫ই জুলাই এক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। শ্রী কল্পরঞ্জন চাকমাকে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয় এবং শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে (সন্তু লারমা) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা) নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে তিন পার্বত্য জেলা

পরিষদে তিনজন চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে পার্বত্য এলাকার উন্নয়নের গুরুদায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এতে করে পার্বত্য এলাকার সার্বিক উন্নয়ন, বহুমুখী কল্যাণ ও সুষম উন্নয়নের যাবতীয় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২০০৯ সালের মার্চ মাসে সরকার আমাকে রাঙ্গামাটির জেলা প্রশাসক পদে পদায়ন করে। তিন বছরের অধিক কর্মকালে বাস্তবে এই অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন কত ত্বরান্বিত হয়েছে তা দেখেছি। সেখানকার লোকজ ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির পাশাপাশি মূল ধারার সাংস্কৃতিক চর্চা সমানভাবে প্রবহমান। মহাসমারোহে বৈসাবি উৎসবের পাশাপাশি পালিত হয় বাংলা নববর্ষ। একইভাবে মহা-আনন্দে উদ্‌যাপিত হয় ঈদ উৎসব ও দুর্গাপূজা। সংস্কৃতির বিবর্তনের এসব নবরূপ পরিস্থিতি আমাদের পার্বত্য সংস্কৃতিকে বিকশিত করছে বিভিন্নভাবে। বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য– কী চমৎকার!

পার্বত্য শান্তিচুক্তি এবং এর বাস্তবায়ন বিষয়ে পার্বত্যবাসীদের কারো কারো মধ্যে কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেও একথা অনস্বীকার্য যে, পার্বত্য চুক্তির কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার এবং জাতিসত্তাগত স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখার পাশাপাশি জাতীয় মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে এই অঞ্চলে বসবাসরত পাহাড়ি ও বাঙালি নির্বিশেষে সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সমৃদ্ধ জনপদ গড়ার সম্ভাবনা দিনে দিনে বিকশিত হচ্ছে, যা বাস্তবে সকলেই দেখতে পাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ, বিচক্ষণ নেতৃত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা, তাঁর সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সফল সংলাপ এবং শান্তি স্থাপনে উভয় পক্ষের সদিচ্ছার ফলেই সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী চলমান এ জটিল সমস্যা সমাধানকল্পে এই ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয়েছে। দেশে-বিদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের এই উদ্যোগ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তির মাধ্যমে কোনো তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা ছাড়াই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান এবং শান্তি স্থাপনের স্বীকৃতিস্বরূপ শান্তির দূত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মর্যাদাপূর্ণ বহু সম্মাননা লাভ করেন।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

সৌরেন চক্রবর্তী: সাবেক সিনিয়র সচিব

নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে নতুন হটলাইন চালু

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যক্রম পরিচালনা করছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) উইমেন সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ৪ঠা অক্টোবর 'নারী ও শিশু নির্যাতনকে না বলুন'– প্রত্যয় নিয়ে গঠন করা হয়েছে কুইক রেসপন্স টিম। ডিএমপি'র মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য একটি হটলাইন নম্বর (০১৩২০০৪২০৫৫) চালু করেছে ডিএমপি কুইক রেসপন্স টিম। ডিএমপি'র মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মো. ফারুক হোসেন জানান, যে-কোনো বয়সের নারী ও শিশুকে উদ্ধারপূর্বক আইনি সহায়তা প্রদান করতে সপ্তাহের ৭ দিন ২৪ ঘণ্টাই কাজ করে যাচ্ছে কুইক রেসপন্স টিম। বাংলাদেশের যে-কোনো স্থান থেকে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু এই হটলাইন নম্বরে কল করে সব ধরনের আইনি পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন।

প্রতিবেদন: আরাফাত রহমান

আমার প্রিয় লেখক শেখ হাসিনা

সৈয়দা নাজমুন নাহার

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ থেকে জানুয়ারি ১৯৯৭– নয় বছর। শেষ গ্রন্থটি ছাড়া মাঝখানে পুরো দুবছর ব্যবধান রেখে চারটি গ্রন্থ– প্রচলিত ধারায় সংখ্যার হিসাবে খুব বেশি নয়; কিন্তু দারুণভাবে নিয়মানুবর্তী। সে অর্থে তাঁর লেখক হওয়ার কোনো প্রতিবেশ বা তাগিদ ছিল কি? সাধারণ অর্থে উত্তরটি প্রায় নিঃসংশয়ে 'না' হওয়ারই কথা। অন্তত আমাদের দেশে লেখালেখির ক্ষেত্রে রাজনীতিকদের তেমন বেশি ঐতিহ্য নেই। অবশ্য রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সাধারণ কেউ নন তিনি। বিশ্বব্যাপী যে অল্প কজন রাজনীতিকের রয়েছে উজ্জ্বল পারিবারিক উত্তরাধিকার, তিনি তাঁদের অন্যতম। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা। অভিজ্ঞতার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ক্রমাগত চড়াই-উতড়াইয়ের মাধ্যমে তিনি আজ যে শীর্ষাবস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাতে সবাই তাঁকে লক্ষ্যসফল একজন রাজনীতিক হিসেবেই চিহ্নিত করে থাকে। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর নাম শেখ হাসিনা। তাঁর সর্বব্যাপ্ত অন্যসব পরিচয়ের তুলনায় লেখক পরিচয়টি মোটের ওপর অনুল্লেখ্য বা অপরিচিতই ছিল। কিন্তু সময়ের নিক্তি একজন মানুষকে তাঁর সকল পরিচয়ের প্রেক্ষাপটেই বিশ্লেষণ করে থাকে। এই গ্রন্থ পরিচয় ঐ বিশ্লেষণের সহায়ক উদ্যোগ। আমরা এখানে তাঁর গ্রন্থগুলো ধারাবাহিকভাবে স্বল্প পরিসরে আলোচনা করব।

I iv †UvKvB †Kb: শেখ হাসিনার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *ওরা টোকাই কেন*। শুরুতেই লেখকের কথা থেকে পেছনের একটি প্রশ্নের মোটামুটি উত্তর পেয়ে যাই। লেখক জানিয়েছেন, 'প্রকাশকের অনুরোধ কিছু লিখতেই হবে ...'। একজন মানুষের লেখক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া নির্দেশ করা এ রচনার লক্ষ্য না হলে, আমরা গ্রন্থের সবকটি রচনার পেছনে সেই মননগত আনুগত্য ও মর্মঘনিষ্ঠতা লক্ষ করি; কেননা তিনি তাঁর রচনার আঙ্গিক নিয়েও ভাবিত। '... আমি প্রাবন্ধিক নই। তাই প্রবন্ধের নির্দিষ্ট নিয়ম আমি মানতে পারিনি। ... তাই প্রবন্ধের ছকে বাঁধা নিয়মে আমার লেখাগুলো হয়ে ওঠে না। এগুলোকে আমার রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার প্রবন্ধ হিসেবে পাঠকসমাজ গ্রহণ করবেন বলে আশা রাখি ...'। এ গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকায় ড. আনিসুজ্জামানও উক্ত বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন।

বিভিন্ন ঘরানার ছয়টি রচনা দুই মলাটে আত্মপ্রকাশ করেছে *ওরা টোকাই কেন* গ্রন্থে। গ্রন্থের রচনা 'স্মৃতির দখিন দুয়ার' নামেই এর স্বরূপ ও প্রকৃতি দ্বিধাহীন। মাঝারি দৈর্ঘ্যের স্মৃতিচারণমূলক এ রচনায় শেখ হাসিনা মূলত তাঁর টুঙ্গিপাড়া কেন্দ্রিক শৈশবকেই চিত্রিত করেছেন; মাঝে মাঝে হানা দিয়েছে তাঁর সমকালীন ভাবনা, অবশ্য তা নিতান্তই প্রসঙ্গক্রমে। এখানে টুঙ্গিপাড়া গ্রামবাংলার সনাতন গণ্ডি পেরিয়ে এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে চিহ্নিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগসূত্রে এ গ্রাম ভিন্ন এক মাত্রায় আমাদের কাছে পরিচিত এবং সে যোগসূত্রের বিশ্বস্ত পরিচয়ও ফুটে ওঠে শেখ হাসিনার শৈশব স্মৃতির পাশাপাশি। তাঁর শৈশব যেন এ গ্রামটির সমস্ত সত্তার নির্যাসে নির্মিত। পূর্বপুরুষের স্মৃতি থেকে শুরু করে, নিকট অতীতের ১৯৫২, ১৯৭১, ১৯৭৫ ছুঁয়ে ছুঁয়ে শেখ হাসিনা বাল্য-কৈশোরের অনিন্দ্য দিনগুলো পেরিয়ে পৌঁছে গেছেন গ্রামোন্নয়নের সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তে। শিক্ষাজীবনের স্মৃতিপরায়ণতায় তাঁর মানসগঠনে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভূমিকাও আমাদের বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। সব মিলিয়ে সমগ্র রচনাটি নিপুণ গঠনশৈলীর শিল্পিত কোনো ভাস্কর্যের মতো, আর তার উত্থান-পতন কোণে পেলবতা ও মাধুর্যে কবিতার স্বাদ।

গ্রন্থের পরবর্তী রচনা 'বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সেনাবাহিনী'। '...যারা, সেনাবাহিনীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছেন। তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন...'। নিবন্ধের প্রায় সূচনার এ উদ্ধৃতির মাধ্যমেই এ রচনার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি নিরূপিত। শেখ হাসিনা পর্যায়ক্রমে যুক্তি, উদাহরণ ও ইতিহাসের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে পৌঁছে গেছেন তাঁর রচনা-লক্ষ্যে। দীর্ঘদিন ধরে বঙ্গবন্ধু ও সেনাবাহিনীকে যে বিরুদ্ধ অবস্থানে স্থাপনের চেষ্টা চলছিল, নিবন্ধকার তাঁর ঋজু ও যৌক্তিক লেখার মাধ্যমে তা নস্যাৎ করেছেন। ১৯৭৫-এর কৃষ্ণ অধ্যায়ের জন্যে ঢালাওভাবে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত ও উচ্চারিত হয়, লেখক তা-ও প্রত্যাখ্যান করেছেন বর্তমান নিবন্ধে। পাশাপাশি জাতীয় রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে তুলনামূলক আলোচনা। বিশেষত বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৭৫-এর পর থেকে শুরু করে কীভাবে সেনাবাহিনীর অযাচিত হস্তক্ষেপে আমাদের রাজনৈতিক ও মানবিক অধিকার কলুষিত হয়েছে, লেখক তা প্রায় একাডেমিক দক্ষতায় আলোচনা করেছেন। সামগ্রিকভাবে নিবন্ধটি বঙ্গবন্ধু ও সেনাবাহিনী সম্পর্কে একটি উদাহরণযোগ্য আলোচনা।

ওরা টোকাই কেন গ্রন্থের হ্রস্বতম রচনা 'রাষ্ট্রীয়ধর্ম কার স্বার্থে'। এপ্রিল ১৯৮৮-তে *সাপ্তাহিক রোববার*-এ যখন এ রচনাটি প্রকাশিত হয়, সচেতন জনগোষ্ঠী তখন এটিকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন; কেননা তখন ঐতিহ্যগতভাবে আধুনিক এক জনগোষ্ঠীকে 'রাষ্ট্রধর্মের' জিগির তুলে অন্ধকারের দিকে পিছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছিল রাষ্ট্রীয় প্রযত্নে। সে ছিল এক দুর্ভাগ্যের কাল। বাড়তি দুর্ভোগ হিসেবে চেষ্টা চলছিল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি

আরোপের। নিবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচিত স্বার্থবাদী সেইসব চরিত্রগুলো, যাদের আরাষ্ট্র লোভেরই প্রয়োজন পড়েছিল ধর্মকে চলমান রাজনীতির নোংরামির সঙ্গে যুক্ত করার। শেখ হাসিনা ধাপে ধাপে দেখিয়েছেন, কারা এবং কীভাবে একটি রাষ্ট্রের ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য বিকৃত করার হীন উদ্দেশ্যে ধর্ম, জাতীয়তা, ইতিহাস, কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে গোষ্ঠীগত স্বার্থে ব্যবহার করছে। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও প্রারম্ভেই আলোচিত হয়েছে ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে। এ নিবন্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশেষভাবে বিবেচ্য।

'বন্যাদুর্গত মানুষের সঙ্গে' বর্তমান গ্রন্থের চতুর্থ রচনা। দিনপত্রীর আঙ্গিকে বিন্যস্ত এ রচনা। বন্যা নদীমাতৃক এ দেশের নিত্যকার সঙ্গী। আমাদের অন্যান্য দুর্ভোগের আয়তন অনেকগুণ ফুলেফেঁপে বেড়ে ওঠে এই বন্যার আগমনে। কিন্তু এ দেশের রাজনীতিকরা যেন এই স্বাভাবিকতার অনেক ঊর্ধ্বে, জেনেও জানেন না, বুঝেও বোঝেন না। অন্তত আজ অবধি তেমন কোনো দৃষ্টান্ত চোখে পড়েনি। সম্ভবত শেখ হাসিনার এ রচনার মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি এর ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রমের কারণ হচ্ছে– তিনি দুর্গতদের সঙ্গে একই কাতারে দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করেছেন বিপর্যয়। রচনার ছত্রে ছত্রে রয়েছে তার অনুপুঙ্খ বিবরণ। একইসঙ্গে তিনি আমাদের বিবেকের শিকড় আলগা করে দেন তথাকথিত রাজনীতির স্বরূপ উন্মোচন করে। সমগ্র রচনার মাধ্যমে আমরা আবিষ্কার করি সম্পূর্ণ অচেনা এক শেখ হাসিনাকে। অনুভবে, ভাষার ব্যবহারে, প্রতিবাদে কখনো সে দরদি, কখনো তীক্ষ্ণ, কখনো বা ঋজু, উচ্চকিত।

গ্রন্থের পঞ্চম রচনা 'নূর হোসেন'। বেশ আগে রচিত হলেও এ নিবন্ধ ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এখনও নতুনত্বের দাবিদার। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিবাদ যে এ ভূখণ্ডের অধিবাসীদের নিয়তি, সেই নিয়তির প্রয়োজনে বার বার তারা অনন্য উদাহরণ হয়ে প্রাণ দিয়েছেন। সেই তালিকার এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের নাম নূর হোসেন। সে এখন স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের অনুপম প্রতীক। এই প্রতীককে শেখ হাসিনা ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর বর্তমান রচনায়। নূর হোসেনকে কেন্দ্রে স্থাপন করে তিনি উন্মোচন করেছেন 'মার্শাল ডেমোক্রেসি' বা সামরিক গণতন্ত্রের মুখোশ। এখানে যেমন এরশাদীয় গণতন্ত্রের চালচিত্র নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে, তেমনি লিপিবদ্ধ রয়েছে নূর হোসেনের সেই অবিস্মরণীয় মৃত্যুর অনুপুঙ্খ বিবরণ। শেখ হাসিনা যে রকম নিখুঁত আঁচড়ে আট-এর দশকের শেষার্ধের স্বৈরাচারবিরোধী প্রতিবাদের আখ্যান লিখেছেন, কোনো রাজনীতিকের কলমে তা সত্যিই বিরল।

এ গ্রন্থের শেষ রচনায় শিরোনামই গ্রন্থ-শিরোনাম হিসেবে গৃহীত। এ রচনার শিরোনামই একটি পরিপূর্ণ আলোচনা। এতদিন আমরা 'টোকাই' শব্দটি নিয়ে যে বিজ্ঞাপন সর্বস্ব ঢোলের মাতমে মুগ্ধ ছিলাম, এ রচনাটি যে সে রকম আপাত দরদি কোনো দায়সারা কর্তব্য পালন নয়, শুধু এ কথাটি নির্দ্বিধায় বলা যায়। পাঠক অন্তত একটি বিষয়ে একমত হবেন, এমন আশা নিয়ে *ওরা টোকাই কেন* গ্রন্থের আলোচনা শেষ করা যাক। এ রচনাটির প্রয়োজন সেদিনই ফুরাবে, যেদিন লেখক শেখ হাসিনার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও জানব, এ দেশ আর 'টোকাই' বানানোর যন্ত্র নয়।

e¨vsjv‡`‡k ¯^iZ‡š¿i Rb¥: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩-এ প্রকাশিত হয় শেখ হাসিনার দ্বিতীয় গ্রন্থ *বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম*। এই দ্বিতীয় গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেন– ' ...লেখার অভ্যাস তেমন নেই। ... তাই যারা লেখক তাদের লেখার ধারাবাহিকতা, লেখনী নৈপুণ্যও আমার নেই। যা লিখি অনেকটা মনের তাগিদে। ...আমি রাজনীতি করি।' তথাপি সব কিছুর পরও তিনি লিখেছেন, লিখছেন এবং লিখবেনও।

বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম বিভিন্ন আঙ্গিকের নয়টি রচনার একত্র সমাবেশ। পৃষ্ঠা সংখ্যার বিচারে গ্রন্থের দীর্ঘতম রচনাটিই গৃহীত হয়েছে গ্রন্থ-শিরোনাম হিসেবে। এ নিবন্ধে তিনি স্বৈরতন্ত্রের জন্মরহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে স্বৈরতন্ত্রের ইতিহাস যেমন অনুসন্ধান করেছেন, তেমনি উন্মোচন করেছেন স্বৈরতন্ত্রের আপাত মহৎ মুখোশ। সুদূর আইয়ুব শাহী স্বৈরতন্ত্র থেকে শুরু করে জিয়াউর রহমানের কাল ছুঁয়ে তিনি এরশাদের স্বৈরকালে পৌঁছেছেন। বাঁক পরিবর্তনের মধ্যমায় তিনি চতুর্থ সংশোধনী সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার অবতরণ করে দেখিয়েছেন এর উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি, যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সমালোচনায় যারা এ অস্ত্রটি ব্যবহার করেন তাদের জন্যেও রয়েছে চিন্তা-উদ্দীপক বিশ্লেষণ। এ প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গবন্ধুর যে দুটি ভাষণের দীর্ঘ উদ্ধৃতি করেছেন, তা থেকে পাঠক সাধারণ নিজস্ব বিশ্লেষণকেও উজ্জীবিত করতে পারবেন। এ নিবন্ধের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গ। এখানে তিনি স্বাধীনতা-পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের জারি করা বিভিন্ন আইনের বর্ণনার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর সেসব আইনের বিলোপ বা পরিবর্তনের তালিকাও দিয়েছেন। এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা আর কঠিন থাকে না, কারা ১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিয়েছিল। এরপর লেখক দেখিয়েছেন বিএনপি ও জাতীয় পার্টির চারিত্রিক ঐক্য। সবচেয়ে কৌতূহল উদ্রেককারী বিষয় হচ্ছে পাকিস্তানের একটি বিশিষ্ট পত্রিকার উদ্ধৃতি। উক্ত *দি হেরাল্ড* (করাচি) পত্রিকার ১৯৯১ ডিসেম্বর সংখ্যার ঐ প্রবন্ধের অংশবিশেষ জেনারেল জিয়ার দল গঠন সম্পর্কে গোয়েন্দা যোগসাজশের ইঙ্গিত রয়েছে। রচনাটি শেষ হয়েছে স্বৈরতন্ত্রের হাত থেকে জনগণের মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় রচনা 'প্রকৃতির কাছে মানুষ অসহায়'। ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিলে স্মরণকালের এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে। সে ঝড়ের অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতির একটি ছবি ফুটে উঠেছে এ রচনাটিতে। লেখক শেখ হাসিনা তখন সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে মানবিক তাগিদে কীভাবে ভাগ্যাহত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন আপনজনের মতো, তার বর্ণনা রয়েছে আত্মোপলব্ধির আলোকে। সর্বস্ব

হারিয়ে মানুষ যখন ভাগ্য আর ত্রাণের জন্য অপেক্ষা করে, তখনও আমাদের রাজনীতি কোন খেলায় মেতে ওঠে তার প্রত্যক্ষ বর্ণনা তুলে ধরেছেন লেখক। পাঠক এ রচনা থেকে পেতে পারেন শত প্রতিকূলতায়ও বেঁচে থাকার প্রেরণা। আবার অদৃষ্টবাদীদের জন্যেও এক ধরনের আশ্রয় তো থাকছেই– কী শিরোনামে, কী উপসংহারে। প্রকৃতিকে জয় করতে উন্নত দেশসমূহের সাফল্যের কথা বলার পর পরই শেষ স্তবকে লেখক আমাদের উপহার দেন বিস্ময়তাড়িত একটি বাক্য– 'বার বার এ কথাই শুধু মনে হচ্ছিল, সভ্যতা যত এগিয়ে যাক, বিজ্ঞান প্রযুক্তি যতই আধুনিক হোক– প্রকৃতির কাছে মানুষ কত অসহায়!'

গ্রন্থের পরবর্তী রচনার শিরোনাম 'শেখ মুজিব আমার পিতা'। সম্পর্কের কথা পুনর্বার উল্লেখ না করেও যে বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা যায়, তা হচ্ছে– এ রচনায় আমরা পাব এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগের স্মৃতি মন্থন করে স্মৃতির ভবিষ্যতে যাত্রা লেখকের। তারপর তিনি আমাদের সামনে খুলে দেন এক অনন্য জীবনের অবয়ব। রচনার প্রধান অংশজুড়েই রয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের টুঙ্গিপাড়া কেন্দ্রিক জীবনালেখ্য। একদিকে কন্যা যেমন স্মৃতিচারণ করেছেন পিতার জন্যে, তেমনি এটি হচ্ছে সেই বিরল রচনা, যাতে একজন রাজনীতিক নির্মাণ করছেন পূর্বসূরি কোনো মহান রাজনীতিকের জীবনী-ভাস্কর্য।

গ্রন্থের বর্তমান রচনায় লেখকের ব্যক্তি জীবনের দুটো ঘটনার সমাবেশ। একটি হচ্ছে ক্লাস নাইনে পড়াকালীন পৌরনীতিতে লেখকের পাসের চাইতে এক নম্বর কম পাবার নাটকীয় উত্তেজনায় ভরপুর ঘটনা; অপরটি হচ্ছে প্রথম চট্টগ্রাম ভ্রমণ কেন্দ্রিক। সাহিত্যমনস্ক পাঠক মাত্রই 'প্রতীক' শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। এই বিশেষ 'অলংকরণ' সাহিত্যে শিল্পের গোপন জঠর থেকে যে রহস্যের, যে সত্যের দরোজা খুলে দেয়, সেই একই দরোজার চৌকাঠে দাঁড় করিয়ে দেয় লেখকের এ রচনাটি। লেখক যেন আপাত বিচ্ছিন্ন প্রতীকী দুটো ঘটনার মাধ্যমে আমাদের চৈতন্যকে পৌঁছে দেন রচনার শিরোনামে– সে হচ্ছে 'অর্থসহ' স্বাধীনতার এক অনন্য স্বপ্ন। রচনাটির শিরোনাম 'অপূর্ণ রয়ে গেল যে স্বপ্ন'। রচনাটির শেষাংশ থেকে উদ্ধৃতির মাধ্যমে সে স্বপ্নটিকে আরেকটু বিবৃত করা যাক– '... স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তাঁকে হত্যা করলো। এই হত্যার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার চেতনাকেই হত্যা করা হলো। আজ আমাদের জন্য স্বাধীনতা শব্দটাই শুধু আছে। অপূর্ণ রয়ে গেছে আব্বার সেই স্বপ্ন।'

পৃথিবীর ইতিহাসে সপরিবার বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মতো বর্বরতম ঘটনা আর ঘটেনি। সেই হত্যাকাণ্ডের ক্ষত ঘুচিয়ে একজন মহান মানুষের, অবিস্মরণীয় নেতার আত্মজা কীভাবে রক্তাক্ত হয়েছেন, তা লিপিবদ্ধ হয়েছে লেখক শেখ হাসিনার বর্তমান রচনায়। 'ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড' রচনায় কন্যা শেখ হাসিনা আমাদের বিবেককে লজ্জায় নতমুখে দাঁড় করিয়ে দেন। প্রায় দেড় দশকের (রচনাকাল : ১২ই আগস্ট ১৯৮৯) নির্বিকার গণচিত্ত তাঁর রচনার মাধ্যমে প্রকারান্তরে অভিযুক্ত হয় বিবেকের কাঠগড়ায়। তিনি পলাশী ট্র্যাজেডির সঙ্গে মিল খুঁজে পান বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে, সেখানেও অভিযুক্ত আমরাই, এটাই হয়ত বাঙালির নিয়তি– যথাসময়ে, যথাযথভাবে মীরজাফরদের প্রতিরোধ করতে পারেনি বাঙালি। লেখক তাঁর নিজস্ব ভাষা বিন্যাসে আমাদের জানিয়ে দেন 'মুজিববিহীন বাংলাদেশের আজ কী অবস্থা'? রচনার শেষ স্তবকে এই হত্যাকাণ্ডের হোতা হিসেবে উচ্চাভিলাষী সামরিক স্বৈরতন্ত্রকেই দায়ী করেন এবং তাঁর আস্থা গণতন্ত্রের সেই অমোঘ নিরাময়ের ওপর। লেখকের বিশ্বাস ও প্রত্যয়– '... জনতার আদালতে খুনীদের বিচার করবো। ষড়যন্ত্রকারীদের মূলোৎপাটন করে বাংলার মানুষকে বাঁচাবো'। এখানে তাঁর কণ্ঠ আর ব্যক্তিগত নয়, সর্বজনীন ঝঙ্কারে ঐ কণ্ঠস্বর তখন গণসংগীতের উদ্দীপনা।

'স্মৃতির দখিন দুয়ার' এ গ্রন্থের ষষ্ঠ নিবন্ধ। ঠিক এ নামেই রয়েছে *ওরা টোকাই কেন* গ্রন্থের একটি রচনা। এ রচনাটি 'একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বরের স্মৃতি থেকে সংকলিত। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু যখন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি, তখন তাঁর পরিবারও স্বদেশে বন্দি যুদ্ধোন্মত্ত পাকিস্তানিদের হাতে। সেই বন্দি জীবনের কয়েক টুকরো ছবি এই রচনা। বঙ্গবন্ধুর পরিবার কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের বিজয় দিবস পর্যন্ত বন্দি জীবন অতিবাহিত করেছে তার অম্লমধুর আখ্যান এ রচনা। আদ্যোপান্ত স্মৃতি ঘনিষ্ঠতায় পাঠক লেখকের নিজস্ব শৈলীতে জানতে পারেন তৎকালীন বাংলার কেন্দ্রীয় পরিবারটির সেই উৎকণ্ঠ দিনগুলোর কথা। এখানে এ মন্তব্য যোগ করা যায়, শেখ হাসিনার লেখনীর পূর্ণ বিকাশ লক্ষ করা যায় এ জাতীয় স্মৃতিচারণমূলক রচনায়।

'কিন্তু কেন' গ্রন্থের অষ্টম রচনা। এ রচনা আবর্তিত বাংলাদেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে। গত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে (১৯৯১) কেন্দ্র করে দেশের রাজনীতিতে যে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল তার নতুন বিশ্লেষণ এই রচনা। স্বাধীনতাবিরোধীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার ফলে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছিল মূলত তারই জবাব এ রচনা। গোলাম আযম, আবদুর রহমান বিশ্বাস, কিংবা তারও আগে শাহ আজিজকে কারা পুনর্বাসিত করেছে

এক নজরে শেখ হাসিনার গ্রন্থসমূহ

- সাদা কালো
- Democracy in Distress Demeaned Humanity
- আমাদের ছোট রাসেল সোনা
- আমরা জনগণের কথা বলতে এসেছি
- Living In Tears
- রচনাসমগ্র-১
- রচনাসমগ্র-২
- সামরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র
- Development For The Masses
- Democracy Proverty Elimination and Peace
- বিপন্ন গণতন্ত্র লাঞ্ছিত মানবতা
- People And Democracy
- সহে না মানবতার অবমাননা
- ওরা টোকাই কেন
- বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- শেখ মুজিব আমার পিতা
- সবুজ মাঠ পেরিয়ে
- দারিদ্র্য দূরীকরণ: কিছু চিন্তাভাবনা
- বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ
- নির্বাচিত ১০০ ভাষণ
- নির্বাচিত প্রবন্ধ
- The Quest For Vision 2021 - 1st part
- The Quest For Vision 2021 - 2nd part
- Miles to Go: A Collection of Speeches of Prime Minister Sheikh Hasina

সে বিষয়ে লেখক খোলামেলা মতামত দিয়েছেন। এ রচনার মূলভিত্তি চলমান রাজনীতি এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য যেসব ঘটনা সন্নিবেশিত হয়েছে তাও নিখাদ রাজনীতির বিষয়। এ রচনাটি রাজনীতি-ঘনিষ্ঠ কিংবা রাজনীতি-উৎসাহী বা সচেতন-পাঠকদের চিন্তা-চেতনাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করবে।

'একানব্বইয়ের ডায়েরী থেকে' এ গ্রন্থের সর্বশেষ রচনা। মোট এগারোটি সংখ্যা শিরোনামে পরিচ্ছেদের মতো ভাগ ভাগ করে এ রচনাটি সাজানো। যদিও ১৯৯১-এর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের স্মৃতিকে অবলম্বন করেই অগ্রসরমান, তথাপি কোনো নির্দিষ্ট রচনা লক্ষ্যে ধাবিত হয়নি এ রচনা। স্মৃতি যেমন এলোমেলো নিয়ম না মানা, যেমন মূল ঘটনার ছায়া অনুসরণ করে কখনো কখনো ছাপিয়ে উঠেছে অপরাপর আপাত অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা, স্মৃতি। তবে খুব বিমূর্ত হলেও নির্দিষ্ট এক ঐক্যের সুতায় সমগ্র রচনাটি গ্রন্থিত। আমাদের অনুমান করতে বাধা নেই, রচনাটি প্রায় সরাসরি দিনপঞ্জি বা ডায়েরি থেকেই আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে, কেননা পূর্ববর্তী বা অন্যান্য রচনার থেকে পৃথক ও স্বাধীন এক ব্যক্তিসত্তা নির্জলা বিশ্বাস ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করেছে রচনাটি। এর ভাষা কখনো কখনো কবিতায় সমগোত্রীয়, যেমন– 'মহাকবি আলাওলের সুধাময়ী সুরজালের মূর্ছনা তোলা এই জনপদ। সে রোসাঙ্গ দেশ বা রোসাঙ্গরাজের আজ অস্তিত্বও নেই। কিন্তু আছেন মহাকবি আলাওল। আছে চট্টগ্রাম। সাগর বেষ্টন যাকে আবদ্ধ করেছে– মহা প্রেমে মহা মায়ায়...'। আবার তিনি নিজেকেই ছড়িয়ে দিয়েছেন অপরূপ উচ্ছ্বাসে– '...এ যেন সুন্দরের এক বিরাট মেলা বসেছে প্রকৃতিজুড়ে। সুন্দর! অপরূপ সুন্দর! চারদিকে যা দেখি তা সবই সুন্দর। যা কিছু বিশ্ব চরাচরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তা সবই যেন মনে হয় বিপুল সৌন্দর্যের এ মেলায় একাকার হয়ে গেছে। সাগর আমাকে বড় আকর্ষণ করে ...'। সবচেয়ে বেদনাবিধুর ও সার্থক অংশটি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত চট্টগ্রামের সঙ্গে ১৯৭১-এর নির্যাতিতা নারীদের তুলনা। সেটিই হচ্ছে রচনার শেষ পরিচ্ছদ; এর মাধ্যমে লেখক শেখ হাসিনার মানবিক মূল্যবোধ ও চেতনার একটি পরিচয় আংশিক হলেও ফুটে উঠে।

`wi`¨ `ÏKiY: wKQzPšÍv fvebv: তৃতীয় গ্রন্থ *দারিদ্র্য দূরীকরণ: কিছু চিন্তাভাবনা* প্রকৃতপক্ষে নানান স্বাদ ও মাত্রার ছয়টি প্রবন্ধের সমারোহ। বিষয় বিচ্ছিন্নতার আড়ালে মনন ও চেতনার কোনো একক লক্ষ্যে প্রবাহিত। হয়ত এ কারণেই প্রকৃতি ও প্রেক্ষিতগত ব্যবধানের পরও ঐ বিচ্ছিন্ন ধারাগুলো এই গ্রন্থের দুই মলাটের পাড়ে পরিবেশিত হয়েছে। লেখক শেখ হাসিনা এখানে তাঁর লেখনীর লক্ষ্য সম্পর্কে ভূমিকার প্রায় শেষাংশে জানিয়েছেন– 'আমার লেখা বঞ্চিত মানুষগুলির জন্য, যদি তাদের জন্য কিছু করতে পারি। সমাজের অবহেলিত মানুষকে টেনে তোলার প্রচেষ্টা প্রতিনিয়ত করে যাব।'

প্রবন্ধকার জানিয়ে দিচ্ছেন– 'ছোট ছোট নানা ধরনের চিন্তার ফসল আমার লেখাগুলি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ের দিকে যখন তাকাই তখন অনেক কথা চিন্তা মনের মাঝে উঁকি মারে। জনজীবনে যে অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা তা উদ্বিগ্ন করে তোলে। মানুষের জীবনের কোন মূল্য নেই...'। তিনি আরও জানাচ্ছেন– '...সবাই ছুটছে, ছুটছে। ছুটছে কীসের আশায়, কোন মরীচিকার পিছনে– ছুটছে অর্থ, সম্পদ, বিলাসী সামগ্রীর পিছনে। মানুষ কি একবারও ভাবে একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে– মৃত্যু হচ্ছে সব থেকে বড় সত্য...'। অনিশ্চয়তায় মূল্যহীন তৃতীয় বিশ্বের জীবন এবং ভোগ ও বিলাসের পেছনে ধাবমান তথাকথিত সভ্যতার টানাপড়েনের দ্বন্দ্বে এমন অনালংকারিক সরল ভাষণে আমাদের ফেরাতে চান লেখক। তাঁর রচনাকে মানবতালগ্ন ব্যক্তিগত আবেগ, সারল্য এবং নিজস্ব বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার আলোকেই বিচার করতে হবে; তাঁর ভাষা ও অন্যান্য প্রকরণগত সাফল্য আমরা বাড়তি পাওনা হিসেবেই চিহ্নিত করব।

গ্রন্থের প্রথম রচনাটি নির্দিষ্ট হয়েছে গ্রন্থ-শিরোনামে। রচনার শুরুতেই তিনি কৃষিনির্ভর এ দেশটির প্রধান শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের জীবন বিশ্লেষণ করেছেন অকাট্য বাস্তবতার ঋজু ভাষায়। তাদের শহরমুখিতার ফলাফলকে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে, লেখক তাঁর দরদি লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন মূলোৎপাটিত, বাস্তবতা বিড়ম্বিত মাটির মতোই সরল স্বাভাবিক অগণন মানুষের করুণ জীবনালেখ্য। তিনি রাজনীতিকদের মৃত্তিকালগ্ন অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে, আমাদের সীমিত সম্পদের কথা মনে রেখে, অধিকার ও বিবেকের আত্মপ্রেরণায় দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে তিনটি পদক্ষেপ প্রস্তাব করেছেন। পরবর্তী আলোচনাংশে তাঁর পদক্ষেপসমূহ তিনি বিশ্লেষণ করেছেন বিশেষজ্ঞ মতামত, বাস্তবতা, সীমাবদ্ধতার বিবেচনায়। লেখক শেখ হাসিনা দারিদ্র্য দূরীকরণে অতিমাত্রিক রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীলতার

বিপরীতে সুদূর পরাধীনতার কাল থেকে চলে আসা মানসিকতা নস্যাৎ করে ঐতিহ্যগত সমাজের নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা বিকাশের প্রয়োজনীয়তাকে সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন।

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় রচনা 'সবার উপর মানুষ সত্য'। এ নিবন্ধে বিশ্বব্যাপী ভূলুণ্ঠিত মানবাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। স্বল্প পরিসরেই লেখক বিপন্ন মানবতাকে আলোচনা করেছেন বিশ্বজনীন ক্যানভাসে। লেখক জাতিসংঘের মানবাধিকার সংরক্ষণের ঐতিহাসিক ঘোষণা এবং এর প্রয়োগহীন দেশ-কালব্যাপ্ততা উপস্থাপন করেছেন অনুভূতিবেদ্য উদাহরণ চিত্রিত ভাষায়। শেখ হাসিনা বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী মানবতার বিপর্যয়কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের দেশের দারিদ্র্য, মৌলবাদের উত্থান, সমাজতন্ত্রের পতন, ১৯৭১-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর চরম অমানবিক বিভীষিকা, বসনিয়া হার্জেগোভিনিয়ার গৃহযুদ্ধ, বসনীয় নারী ও শিশুদের নির্মম অভিজ্ঞতার বিপরীতে ওআইসি সম্মেলনের তথাকথিত রেজুলেশন গ্রহণ ইত্যাদি সকল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি ইঙ্গিত করেছেন– মানবতার বিপক্ষে যে অস্ত্র নির্মিত হয়, তার জন্যে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো যে বিপুল অর্থ ব্যয় করে থাকে, সে অর্থই নিয়োজিত হতে পারে শোষিত মানুষ, ক্ষুধার্ত শিশুদের বাঁচার জন্য; অর্থাৎ সে অর্থই ব্যয় হোক মানবতার স্বপক্ষে।

তৃতীয় প্রবন্ধের শিরোনাম 'শিক্ষিত জনশক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত'। দীর্ঘ এ প্রবন্ধে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমেই ড. কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশন সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন– '...অথচ সেই গুরুত্বপূর্ণ দলিল থেকে এখনও আমরা অনেক বিষয়ে দিক নির্দেশনা পেতে পারি'। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের পর কোনো সরকারই এ রিপোর্ট বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেনি এ তথ্যও লেখক জানিয়েছেন।

লেখক এখানে দেখিয়েছেন শিক্ষার মাধ্যমে একটি দেশ তার সকল সমস্যা সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে। এরপর তিনি বাগাড়ম্বরপূর্ণ এবং আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব অথচ ফলাফল শূন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে যথার্থভাবে চিত্রিত করেছেন। পাশাপাশি তাঁর রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্যোগ ও আকাঙ্ক্ষার কথাও বর্ণিত হয়েছে। তিনি উদাহরণ, বাস্তবতা, পরিসংখ্যানের আলোকে শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রহসনমূলক অবস্থানকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। লেখক তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে আমাদের বুঝিয়ে দেন শিক্ষা অন্যান্য বিষয়াবলির সঙ্গে সম্পর্কিত। বিশ্ববিদ্যালয়মুখী শিক্ষাব্যবস্থা পরবর্তী জীবনক্ষেত্রে কীভাবে বেকারত্ব, হতাশা ও অপরাধপ্রবণ জনগোষ্ঠীর জন্য দায়ী। তিনি এ অভিশাপ থেকে মুক্তির মাধ্যম হিসেবে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। সামগ্রিকভাবে তিনি এখনও এই শুভবোধে আস্থাশীল– '...বাঙালি জাতিও নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে বিশ্বসভায় স্থান করে নিতে পারবে'। সেক্ষেত্রে তিনি পূর্বশর্ত হিসেবে শিক্ষিত জনশক্তি বিনির্মাণকেই আবশ্যক মনে করছেন।

গ্রন্থের চতুর্থ নিবন্ধের নাম 'আমাদের চেতনার অগ্নিশিখা'। এ রচনায় তিনি তাঁর স্মৃতিসত্তা নিয়ে সর্বত্র উপস্থিত থাকলেও 'জাহানারা ইমাম' নামের সেই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার সর্বব্যাপ্ত জোয়ারে তিনি যেন স্রোতের মিছিলে আলাদা পরিচয়হীন; তিনি যেন বুকে বেদনাভরা অগণিত জনতারই একজন। হয়ত প্রত্যেকের ভূমিকা বা কারো কারো ভূমিকা ১৯৭১-এর ঘাতক-দালালদের বিচারের দাবিতে যে অবিস্মরণীয় আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তাতে গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু একটি প্রত্যাশার পতাকাতলে যখন সবাই একত্রিত হয় তখন সেই প্রবল ইচ্ছেটাই কী করে মুখ্য হয়ে যায়, তা কুশলী ভাষায় বর্ণনা করেছেন লেখক এবং সেখানেই লেখকের সাফল্য। তিনি ব্যক্তিগত আবেগ, উপস্থিতি যে রকম দক্ষতার সাথে বর্ণনা করেছেন, তেমনি জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে কীভাবে সেই যুদ্ধাপরাধীরা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে নিজের জায়গা করে নেয় তা-ও বর্ণনা করেছেন সমান দক্ষতায়। বঙ্গবন্ধু-পরবর্তী সরকারগুলো কীভাবে তথাকথিত রাষ্ট্রীয় বিধানাবলির মাধ্যমে, কোথায় কোথায় এবং কতটা নগ্নতার সঙ্গে সেই সব ঘাতক-দালালদের পুনর্বাসনে ভূমিকা রেখেছে তার বিশ্বস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এ রচনায়। এখানে শেখ হাসিনা আমাদের জানিয়ে দেন, জাহানারা ইমাম যে চেতনার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন, তা এখনো ফুরিয়ে যাবার মতো নয়। লেখকের অনুকরণীয় প্রত্যয়দীপ্ত শপথ– 'শহীদ জননী তুমি ঘুমাও– আমরা জেগে রব তোমার চেতনার পতাকা তুলে ধরে' এবং এটিই ছিল 'আমাদের চেতনার অগ্নিশিখা'র শেষ স্তবক।

'স্মৃতি বড় মধুর: স্মৃতি বড় বেদনার' নিঃসন্দেহে এ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ রচনা। অপূর্ব এক স্বপ্ন বর্ণনার মাধ্যমে এ রচনার সূচনা। বাঙালির স্বপ্নের মতো এ স্বপ্নটিও হঠাৎ করেই ভেঙে যায়। এই প্রতীকী তাৎপর্য সমগ্র রচনাটিকে অন্য মাত্রা দান করেছে। দ্বিতীয় স্তবকে না আসার আগে পাঠক বুঝতেই পারবেন না সদ্য একটি স্বপ্ন থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। বাংলাদেশের বাস্তবতাও এই স্বপ্নের মতো। বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে কীভাবে সপরিবার ছিনিয়ে নেওয়া হলো সমস্ত বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি ও প্রিয় কন্যাদ্বয়ের কাছ থেকে, তার বিষাদগাথা এই নিবন্ধ। এটি মূলত স্মৃতিচারণমূলক রচনা।

লেখক শেখ হাসিনা ধীরে ধীরে আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটন করেন কীভাবে ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি বাঙালির তীর্থস্থানে পরিণত হলো। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলার আপামর জনগণ ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে কীভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল এই বাড়িটিকে কেন্দ্রে রেখে, তার নিখুঁত চিত্রও রয়েছে এ রচনায়। সমগ্র রচনায় কখনো কখনো হাহাকার ও ক্ষোভ জড়াজড়ি কাব্যময়তা ছাপিয়ে গেছে গদ্যের উঠোন। পক্ষ-বিপক্ষ-নিরপেক্ষ সকলের উচিত লেখক

হিসেবে শেখ হাসিনার অন্তত এই রচনাটির সঙ্গে পরিচিত হওয়া। আবেগ, ইতিহাস, ব্যক্তিগত উপস্থিতি সত্ত্বেও সংযমের অনন্য উদাহরণ এ রচনাটি একজন মানুষ, একগুচ্ছ প্রিয় মানুষ এবং একটি বাড়ির উপাখ্যানের অন্তরালে এক ক্লাসিক ট্র্যাজেডির ঘনভার হাহাকার।

পরবর্তী নিবন্ধটি এ গ্রন্থের শেষ রচনা। নিতান্ত সামাজিক-রাজনৈতিক তাগিদ এর পেছনে ক্রিয়াশীল। নিবন্ধটি তখন আর অধিকারের ইশতাহার নয়, আমাদের অর্জিত অধিকারের স্মারক। 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গে' যে পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে, তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সাম্প্রতিক ও প্রত্যক্ষ। এটি আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে চিহ্নিত হবে। এতে শেখ হাসিনা দেখিয়েছেন স্বৈরতন্ত্রের স্বরূপ। দেখিয়েছেন গণতান্ত্রিক প্রয়োজনেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি কীভাবে এক সর্বব্যাপ্ত আন্দোলনরূপে আবির্ভূত হয়েছে। শেখ হাসিনা তাঁর যুক্তি ও ভাষার স্বকীয় দক্ষতায় রচনাটিতে যুক্ত করেছেন সর্বগ্রাহ্য ভাষ্য।

পরিশেষে *দারিদ্র্য দূরীকরণ: কিছু চিন্তাভাবনা*'র স্বপক্ষে শুধু এ কথাই বলা যায়, গ্রন্থটি কোনো রাজনীতিকের তথাকথিত মতবাদ প্রচারের মাধ্যম নয়। এমনকি সাহিত্য ও ব্যক্তিগত মতবাদ ও লগ্নতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়; তথাপি এ গ্রন্থ একজন রাজনীতিকের, একজন মানুষের নিজস্ব চিন্তাভাবনার আত্মলগ্নতার বাইরেও কোনো সর্বজনীনতা অভিমুখী।

People And Democracy: শেখ হাসিনার কোনো একক তথা মৌলিক গ্রন্থ নয়। এটি লেখকের সরাসরি বাংলা থেকে অনূদিত একগুচ্ছ রচনার সংকলন। এ গ্রন্থে মোট আটটি ভাষান্তরিত রচনা সংকলিত হয়েছে। রচনাসমূহ লেখকের মূল ভাষায় প্রকাশিত পূর্ববর্তী তিনটি গ্রন্থ থেকে গৃহীত। উল্লেখ্য, এ গ্রন্থে মূল ভাষায় সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ *দারিদ্র্য দূরীকরণ: কিছু চিন্তাভাবনা* থেকে চারটি এবং পূর্ববর্তী *ওরা টোকাই কেন* ও *বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম* থেকে দুটি করে রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ গ্রন্থটি উৎসর্গিত হয়েছে লেখকের সর্বশেষ ভ্রাতা শেখ রাসেলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এবং উৎসর্গ পৃষ্ঠার উলটোপিঠে রয়েছে শেখ রাসেল এবং আগস্ট ট্র্যাজেডির সংশ্লিষ্ট 'মুখবন্ধ'। এ গ্রন্থের উৎসর্গ ব্যতীত এ অংশটুকু মৌলিক সংযোজন; অর্থাৎ এ অংশটুকু কোনো ভাষান্তরিত রচনা নয়। এখানে মর্মস্পর্শী ভাষায় লেখক আমাদের ছুঁয়ে যান অশ্রু টলোমলো অনুভবে।

People And Democracy-এর প্রথম নিবন্ধের শিরোনাম 'History's Macabre Tragedy'-এ নিবন্ধটি লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থের পঞ্চম রচনা 'ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড'-এর অনুবাদ। 'Bangladesh: The Roots of Autocracy' নিবন্ধটি একই গ্রন্থের নাম নিবন্ধ *বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম* থেকে অনুসৃত। গ্রন্থের তৃতীয় রচনা 'The Concept of Caretaker Government'-এর মূল নাম রয়েছে *দারিদ্র্য দূরীকরণ: কিছু চিন্তাভাবনা* গ্রন্থের শেষ রচনায় (শিরোনাম: তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গে)। পরবর্তী রচনা 'Noor Hossain: Fighters for Democracy' শেখ হাসিনার প্রথম গ্রন্থ *ওরা টোকাই কেন* গ্রন্থের একটি অবশ্য উল্লেখ্য রচনা। 'নূর হোসেন' শিরোনাম চিহ্নিত স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধের ভাষান্তর। *'Why are they Street Children'* নিবন্ধটির মূলে রয়েছে লেখকের প্রথম গ্রন্থের শিরোনাম নিবন্ধ *ওরা টোকাই কেন*। *People and Democracy* গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রবন্ধ 'Some Thoughts on Poverty Alleviation' প্রবন্ধটি লেখকের তৃতীয় গ্রন্থ *দারিদ্র্য দূরীকরণ: কিছু চিন্তাভাবনা* গ্রন্থের নাম প্রবন্ধ। 'Educated Manpower Development' বর্তমান গ্রন্থের সপ্তম রচনা। এ রচনাটি লেখকের পূর্বোক্ত তৃতীয় গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধ। *People and Democracy*'র শেষ রচনাটির শিরোনাম 'Human is the Highest Truth of All'। এ নিবন্ধটিও লেখকের তৃতীয় গ্রন্থ *দারিদ্র্য দূরীকরণ: কিছু চিন্তাভাবনা* গ্রন্থ থেকে ভাষান্তরিত। বর্তমান রচনাটির মূল রয়েছে উক্ত গ্রন্থের 'সবার উপরে মানুষ সত্য' শীর্ষক দ্বিতীয় রচনায়।

অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে, বর্তমান গ্রন্থের রচনাসমূহ মূল গ্রন্থের রচনাসমূহের শব্দ-বাক্য কাঠামো হুবহু অনুবাদ নয়। বরং অনুবাদ বলতে ভাষান্তর বুঝায়। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে 'ভাবানুবাদ'ই বোঝানো হয়েছে।

নিবন্ধের কলেবর এবং পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কায় লেখক শেখ হাসিনার সকল গ্রন্থের আলোচনা এখানে সন্নিবেশ করা সমীচীন নয়। একজন লেখক হয়ে আরেকজন লেখকের প্রতি দায় হিসেবে শেখ হাসিনার সকল গ্রন্থের আলোচনা সংবলিত একটি গ্রন্থ প্রকাশের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে লেখাটির এখানেই সমাপ্তির রেখা টানছি। এ আলোচনার সঙ্গে শেখ হাসিনার গ্রন্থগুলোর একটি তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে পাঠক এক নজরে লেখক শেখ হাসিনাকে জানতে পারবেন। হয়ত এভাবেই একদিন পূর্ণাঙ্গরূপে চিহ্নিত হবে একজন লেখকের অবয়ব।

সৈয়দা নাজমুন নাহার: বাংলাদেশ বেতারের সাবেক পরিচালক, প্রকাশক, পিয়াল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন্স ও সাপ্তাহিক চারদিক পত্রিকার সম্পাদক, syedanazmunnahar64@gmail.com

প্রেসক্লাব অব ইন্ডিয়াতে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্‌বোধন

ভারতের নয়াদিল্লিতে প্রেসক্লাব অব ইন্ডিয়ায় বঙ্গবন্ধু মিডিয়া কর্নার উদ্‌বোধন করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে নয়াদিল্লির রাইসানা রোডের প্রেসক্লাব অব ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় তলায় ৬ই সেপ্টেম্বর এই কর্নার উদ্‌বোধনকালে ভারত সফররত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুদেশের সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। এই সুসম্পর্ককে এগিয়ে নিতে দুদেশের জনগণের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। প্রেসক্লাব অব ইন্ডিয়ায় বঙ্গবন্ধু মিডিয়া কর্নার নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে একটি মাইলফলক।

প্রেসক্লাব অব ইন্ডিয়ার সভাপতি উমাকান্ত লাখেরার সভাপতিত্বে ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোহাম্মদ ইমরান, প্রেস মিনিস্টার শাবান মাহমুদ, বাংলাদেশের জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, প্রেসক্লাব অব ইন্ডিয়ার সাবেক সভাপতি গৌতম লাহিড়ী এবং সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিনয় কুমার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। প্রেসক্লাব অব ইন্ডিয়া এবং নয়াদিল্লিস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের যৌথ উদ্যোগে গড়ে তোলা আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি সংবলিত বঙ্গবন্ধু মিডিয়া কর্নারে একটি গ্রন্থাগার এবং প্রজেকশন হল রয়েছে। কর্নারের রক্ষণাবেক্ষণে দুই সংস্থার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারকও স্বাক্ষরিত হয়।

প্রতিবেদন: তানজিলা রহমান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ই অক্টোবর ২০২১ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষে উদ্ভাবিত 'বঙ্গবন্ধু ধান-১০০' দিয়ে তৈরি বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি উন্মোচন করেন– পিআইডি

বাংলাদেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা

ড. এন. এইচ. এম. রুবেল মজুমদার

১৬ই অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস। প্রতিবছর বিশ্ব খাদ্য দিবস নতুন নতুন প্রতিপাদ্য নিয়ে পালন করা হয়। 'আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ। উন্নত উৎপাদনে ভালো পুষ্টি আর ভালো পরিবেশেই উন্নত জীবন'– এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ২০২১ সালের বিশ্ব খাদ্য দিবস জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী পালিত হয়। বৈশ্বিক ক্ষুধা, জলবায়ু সংকট এবং কোভিড-১৯-এর বিরূপ প্রভাবে কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তর করার প্রচেষ্টায় বিশ্ব মানুষের অবদান, চেষ্টা ও শক্তির প্রয়াস কাজে লাগানোকে ২০২১ সালের বিশ্ব খাদ্য দিবসের আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে, করোনা অতিমারিতে বিশ্ব খাদ্য পরিস্থিতি এখন সংকটকাল অতিক্রম করছে। তাই এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাদের কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তরের ক্ষমতা আমাদের হাতে নিতে হবে। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশের কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে দিবসটি বিভিন্ন কর্মসূচি, সভা ও কার্যাবলির মাধ্যমে পালিত হয়।

১৬ই অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস উদ্‌যাপনের পেছনে মূলত হাঙ্গেরির তৎকালীন খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ড. প্যাল রোমানির প্রস্তাবকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। তিনি ১৯৭৯ সালে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO, Food and Agricultural Organization) ২০তম সাধারণ সভায় এই দিনটিকে বিশ্বব্যাপী খাদ্য দিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ড. প্যাল রোমানির উত্থাপিত প্রস্তাবকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিষ্ঠার দিনটিতে (১৬ই অক্টোবর ১৯৪৫) বিশ্বব্যাপী বিশ্ব খাদ্য দিবস পালন করা হয়। বর্তমানে ১৫০টিরও বেশি দেশে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালন করা হয়ে থাকে।

খাদ্য ও পুষ্টিজনিত সমস্যা দূর করে দারিদ্র্য-ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী জনসচেনতা বৃদ্ধি করাই হলো বিশ্ব খাদ্য দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য। মানুষের মৌলিক চাহিদার প্রধানতম একটি হলো খাদ্য। খাদ্য মানুষের ক্ষুধাকে নিবারণ করে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে সমন্বিত করার মাধ্যমে দেহের (কোষের) পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে এবং সুস্থ-সবল রাখে। অর্থাৎ পরিমিত, পুষ্টিকর এবং নিরাপদ খাবার গ্রহণ মানবজাতির অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। খাদ্যপণ্য যেহেতু কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বিশ্ব খাদ্য দিবসের আরও একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে– কৃষি উন্নয়নে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার মাধ্যমে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন করে সকল জনগোষ্ঠীর মাঝে খাদ্যপ্রাপ্তির সামর্থ্য নিশ্চিতকরণ, ক্রয় স্বল্পতা বৃদ্ধি করে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ এবং দেহে পুষ্টির যথাযথ উপযোগ সাধন করা। অর্থাৎ খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি খাদ্যের সরবরাহ, লভ্যতা, প্রাপ্যতা এবং সাধারণ মানুষের প্রবেশযোগ্যতাও নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সম্ভব। এছাড়া বৈশ্বিক করোনার কারণে ক্ষুধা-দারিদ্র্যের অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন ও টেকসই কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তর ও প্রসার অনেকটা সংকটের মুখোমুখি। এসব উদ্ভূত সংকটকে আরও ঘনীভূত করতে পারে চলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উন্নত-উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি, কৃষি শ্রমিকের সংকট বৃদ্ধি, খাদ্য উৎপাদনশীলতায় জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবসহ আরও কারণ। ফলে, বৈশ্বিকভাবে খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগের ক্ষেত্রে বাজার শৃঙ্খলের অসাম্যবস্থা, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ সামগ্রিক বিচারে মানবদেহের পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং টেকসই কৃষি খাদ্য ব্যবস্থা (Sustainable Agri-Food System) গুরুত্বের বিবেচনায় খাদ্য দিবসের তাৎপর্য অপরিসীম।

নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাপ্যতা মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে প্রধানতম। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদে খাদ্যকে জীবন ধারণের মৌলিক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করার পাশাপাশি সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে দেশের জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির আলোকে এবং বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা' নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'খাদ্য ও পুষ্টি

নিরাপত্তা' সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অবস্থার উন্নতি এবং ২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০' প্রণয়ন করেছে। এ নীতি খাদ্য ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গরূপে বিবেচনা করে খাদ্য ব্যবস্থার সকল উপাদান এবং উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন, খাদ্য প্রস্তুতকরণ, খাদ্যগ্রহণ ও সদ্ব্যবহার এবং আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত সকল কর্মকাণ্ডের ফলাফল অন্তর্ভুক্ত করেছে। পাশাপাশি এ নীতি পুষ্টি সংবেদনশীল (Nutrition Sensitive) খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে পরিপূরক হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রণীত জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ এবং ২০২০, জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল ২০১৫, জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬ ও জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৬-এর সংগতিপূর্ণ এবং এ নীতির লক্ষ্য অর্জন ও সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশেই পরিপূরক নীতিমালাসমূহে চিহ্নিত আন্তঃখাতভিত্তিক কার্যক্রমসমূহের সফল বাস্তবায়নের ওপর নির্ভরশীল।

বর্তমান সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) কার্যকর সদস্য হিসেবে এবং এই সংস্থার আলোকে বিশ্ব খাদ্য দিবসের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম। কেননা বিশ্ব খাদ্য দিবসের এ উদ্দেশ্যসমূহ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০ এজেন্ডার' সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' আশা করে যে, ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধা নিবৃত্তি ও দারিদ্র্যের অবসান, অপুষ্টি দূরীকরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং উপযোগ সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কৃষক এবং নৃগোষ্ঠীর ন্যায্য সুযোগ তৈরি, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং লাভজনক আয়ের ক্ষেত্রে সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে বিশ্বশান্তি জোরদার করা। আরও উল্লেখ্য যে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে– 'দারিদ্র্য নিরসন' এবং দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো– 'ক্ষুধার সমাপ্তি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং অধিকতর পুষ্টিমান অর্জন ও টেকসই কৃষির প্রসার-প্রবর্তন।' অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের প্রথম ও দ্বিতীয় এজেন্ডার সঠিক বাস্তবায়ন বাংলাদেশের মতো যে-কোনো উন্নয়নশীল দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পথ গতিশীল করে দেশের দারিদ্র্যপীড়িত ও ক্ষুধার্ত মানুষকে অর্থনৈতিক মুক্তি দিয়ে তাদের খাদ্য অধিকার, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে। আর এই খাদ্য অধিকার,

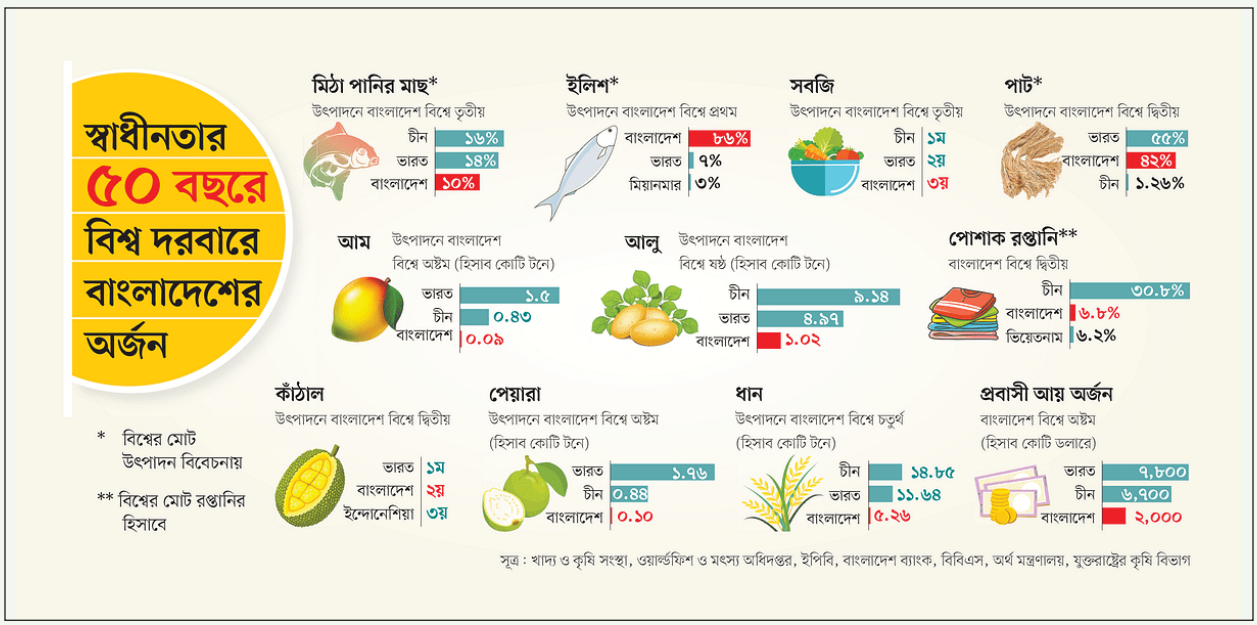

মূল নীতির ওপর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে দেশের জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা, উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং কৃষি উন্নয়নে বদ্ধপরিকর, যা বিগত এক দশকে সরকারের বিভিন্ন কৃষি কর্মসৃজন কর্মসূচি, খাদ্যের উন্মুক্ত বাজার বিক্রয় নীতিমালা এবং সামাজিক সুরক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। সর্বজনীনভাবে বিশ্ব খাদ্য দিবস ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল জাতিকে সচেতনকরণ, টেকসই কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে উৎকর্ষসাধন ও উৎসাহিতকরণ, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার হাত প্রসারিতকরণ এবং সহায়তা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, প্রযুক্তির সমৃদ্ধি এবং উৎকর্ষতাকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্থানান্তর এবং গ্রামীণ নারী ও পশ্চাৎপদ মানুষের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে সমাজে তাদের অবদান সম্পর্কে উৎসাহিতকরণে ভূমিকা পালন করে থাকে।

বিশ্ব খাদ্য দিবসের এ সকল লক্ষ্য ও তাৎপর্যের গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশে ব্যাপক।

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা প্রায় ১.২৫% হারে প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে আবাদি জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। তাই খাদ্য নিরাপত্তার নিয়ামকের মধ্যে 'খাদ্য লভ্যতা এবং খাদ্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি' চলমান রাখা ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তার জন্য অবশ্যই দরকার। জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮ এবং জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি ২০২০-এর আলোকে 'খাদ্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির' লক্ষ্য অর্জনে দানাদার জাতীয় শস্য, শাকসবজি ও ফলমূল, মৎস্য ও প্রাণিজ উৎসের খাদ্যসহ পুষ্টিকর খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধিকরণের কৌশল বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রবর্তন, উন্নয়ন, প্রচার এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিতকরণের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে বর্তমান সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় ও খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক নানামুখী কর্মসূচি/প্রকল্প/কার্যক্রম চালু ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে

কৃষি মন্ত্রণালয়ের 'ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম ২য় পর্যায় (এনএটিপি-২)'-এর আওতায় প্রধান প্রধান ফসল যেমন ধান, গম, টমেটো ও কলা ইত্যাদির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ওপর জোরদার নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিস্তার ও গ্রহণে কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ সেবা এবং কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং ফসল কর্তনোত্তর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ বরাবরের মতো খাদ্য উৎপাদনে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় করোনার এই প্রতিকূলতার মাঝেও চলতি অর্থবছরে (২০২০-২০২১) বোরো ধান ফসলের অর্জিত আবাদের পরিমাণ ৪৮.৮৩৭ লক্ষ হেক্টর, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ০.৭৮৫ লক্ষ হেক্টর বেশি। উৎপাদিত বোরো চালের পরিমাণ ২০৮.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৩.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি। অন্যান্য দানাদার জাতীয় শস্য যেমন গম ১২.৩৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ভুট্টা ৫৬.৬৩১ লক্ষ মেট্রিক টনসহ মোট ৪৫৫.০৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন দানাদার শস্য উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া ৯.৩৯১ লক্ষ মেট্রিক টন ডাল জাতীয় ফসল, ১১.৯৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন তেলজাতীয় ফসল, ১০৬.১২৮ লক্ষ মেট্রিক টন আলু, ৩৩.৬২ মেট্রিক টন পেঁয়াজ এবং ৭৭.২৫১ লক্ষ বেল পাট উৎপাদন হয়েছে। বিশেষ করে ২০২০-২০২১ সালে উৎপাদিত পেঁয়াজ, সূর্যমুখী তেল, ভুট্টা বিগত ২০১৯-২০২০ সালের তুলনায় যথাক্রমে প্রায় ৮.০১৭ লক্ষ মেট্রিক টন, ০.১৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ২.০০৫ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি উৎপাদিত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দানাদার ও অন্যান্য শস্যের এই বেশি উৎপাদনশীলতা বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা বাংলাদেশকে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করার এক অগ্রণী পদক্ষেপ। তাছাড়া বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) ২৯টি, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত ২৩টি, কৃষি বিপণন অধিপ্তরের ২টি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৮টিসহ আরও বিভিন্ন শাখা ও বিভাগের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিতে খাদ্যের উৎপাদনশীলতায় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। খাদ্য উৎপাদনশীলতার পাশাপাশি এসব কর্মসূচি স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণেও অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে 'পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)' এবং 'সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে 'পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য উৎপাদন বহুমুখীকরণ' কৌশলের বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যকর পদক্ষেপ দেশের মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণে অধিক ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে আসছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতো বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ও জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আন্তঃখাত কাঠামোর উন্নয়ন, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য মূল্যে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির সামর্থ্য ও সুযোগ বৃদ্ধিসহ অন্যান্য পুষ্টি সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি, প্রকল্প ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। 'খাদ্যবান্ধব' কর্মসূচি দেশের অন্যতম এবং সবচেয়ে বৃহৎ সামাজিক নিরাপদ কর্মসূচি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত– 'শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ' স্লোগানে চালু হওয়া এ খাদ্য কর্মসূচি ২০১৬ সাল থেকে খাদ্য মন্ত্রণালয় দ্বারা সফলভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ কর্মসূচির আওতায় এখন পর্যন্ত সারা দেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। নিয়মিত কার্যক্রম সম্পাদনের পাশাপাশি এ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি করোনার অতিমারিতে পল্লি এলাকায় বাসবাসকারী ৫ লাখ পরিবারকে ৫ মাসব্যাপী ১০/- টাকা কেজি দরে প্রতিমাসে ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ করে মোট ৭.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। একই কর্মসূচির আওতায় শহরাঞ্চলের মানুষের জন্য ১৮/- টাকা কেজি দরে আটা এবং ৩০/- টাকা কেজি দরে চাল খোলাবাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করে সর্বমোট ৪.২৯ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হয়েছে। করোনাকালীন খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে বিক্রিত চালের পরিমাণ ২০১৯ সালের তুলনায় ২৬.৫৫% বেশি, যা ৫০ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষের সামাজিক সুরক্ষার সফল বাস্তবায়নের প্রতিফলন। খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত 'খাদ্যের দৈনিক পরিস্থিতির রিপোর্ট' অনুযায়ী ১২ই অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত সরকারি খাদ্যশস্যের মজুতের পরিমাণ ১৫.৫১ লক্ষ মেট্রিক টন। সংগ্রহ কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হওয়ায় বর্তমান খাদ্যশস্যের মজুত সন্তোষজনক। দেশ চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও আম্ফান ও বন্যায় উৎপাদন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাজারদর নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও বৈদেশিক সূত্র থেকে ১২ লক্ষ মেট্রিক টন চাল এবং ২.৫ লক্ষ মেট্রিক টন গম আমদানি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। খাদ্য নিরাপত্তার তিনটি নিয়ামকের মধ্যে ক্রয়ক্ষমতা একটি নিয়ামক এবং এটি বাজারদর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্ভব হয়। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চলমান রেখে খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। খাদ্যশস্যের সুষম সরবরাহ এবং বিতরণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা বর্তমান সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ দ্বারা বাস্তবায়ন হচ্ছে। সরকারি বিতরণ পদ্ধতির মাধ্যমে চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আর্থিক খাতে মোট বিতরণ করা হবে ৫০৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ত্রাণমূলক খাত (কাবিখা, টি. আর, ভিজিএফ, ভিজিডি ও স্কুল ফিডিং) নিট বিতরণ ২.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় অনেক বেশি।

দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সুরক্ষায় খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা, সরবরাহ, সংগ্রহ এবং বিপণন প্রক্রিয়ায় সরকার গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ হলো কৃষকের অ্যাপস-এর মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ধান ক্রয় করা, মিল মালিকদের নিকট থেকে অনলাইন পদ্ধতিতে ধান/চাল সংগ্রহ পদ্ধতি চালুকরণ, অতিদরিদ্র জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য পুষ্টি চাল বিতরণ। 'আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে আধুনিক খাদ্য গুদাম নির্মাণের কাজ চলছে, যা দেশের খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা বর্তমানে ২২ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করেছে (২০০৯ সালে ছিল ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন) এবং ২০২৫ সালে ৩০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ আধুনিক ধরনের সাইলো নির্মাণকালে আরও নতুন প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। এই সকল কর্মসূচি এবং নীতিমালার সফল বাস্তবায়নে কৃষিপ্রধান বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী অনেক প্রশংসা ও সুনাম অর্জন করেছে। বিশেষ করে, বর্তমান সরকার কৃষিতে প্রচুর বিনিয়োগ ও আধুনিক জ্ঞান এবং প্রযুক্তির যথাযথ ও সর্বোচ্চ ব্যবহার করে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ (দানাদার খাদ্যে) করেছে। বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতির অনিশ্চিত ও সংকটময় সময়ে খাদ্যের সুষম ও টেকসই ব্যবস্থাপনাকে জোরদার করতে সরকার গ্রহণ করেছে নানামুখী কার্যক্রম।

ড. এন. এইচ. এম. রুবেল মজুমদার: সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর, rubel.infs@gmail.com

জাতিসংঘ দিবস

জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ভাষণ

ড. আবদুল আলীম তালুকদার

জাতিসংঘ বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটি পৃথিবীজুড়ে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য 'জাতিপুঞ্জ' নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করা হয়। কিন্তু সেটি তার উদ্দেশ্য পালনে বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। এর কয়েক বছর পর পৃথিবীর ইতিহাসে শুরু হয় আরও একটি ভয়াবহ যুদ্ধ– যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নামে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩২তম প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট প্রথম 'জাতিসংঘ' গঠনের প্রস্তাব দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বিশ্বের শীর্ষ ক্ষমতাধর দেশগুলোর প্রায় চার বছরের চেষ্টা ও ধারাবাহিক আলোচনার পর বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর প্রাথমিকভাবে ৪৬টি সদস্য দেশ জাতিসংঘ সনদকে অনুসমর্থন দেয়। ১৯৪৭ সালের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ২৪শে অক্টোবরকে জাতিসংঘ দিবস হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে জাতিসংঘ সনদ অনুমোদনের দিনে ১৯৪৮ সালে এ দিবস পালনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। সে থেকে জাতিসংঘ দিবস ২৪শে অক্টোবর বিশ্বের সকল স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে উদ্‌যাপিত হয়। দিবসটিতে জাতিসংঘের বৈশ্বিক অর্জন ও উদ্দেশ্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। পৃথিবীজুড়ে ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালন করার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে জাতিসংঘের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে উৎসর্গ করা হয়েছে।

যে সকল বিশ্ববিশ্রুত মনীষীর অনন্য সাধারণ প্রতিভা ও কর্মনৈপুণ্যে বর্তমান বিশ্বে কোটি কোটি মানুষ পরাধীনতার গ্লানি থেকে পরিত্রাণ পেয়ে স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করছে, সেসব মহামানবের মধ্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। এ প্রসঙ্গে একজন প্রখ্যাত বিদেশি সাংবাদিক তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন এভাবে– 'প্রায় বারো শত বছর পর বাঙালি জাতির পুনর্জন্ম হয়েছে এবং হাজার বছর পর বাংলাদেশ এমন নেতা পেয়েছে, যিনি রঙে-বর্ণে, ভাষা এবং জাতি বিচারে প্রকৃতই একজন খাঁটি বাঙালি। বাংলাদেশের মাটি ও ইতিহাস থেকে তাঁর সৃষ্টি এবং তিনি বাঙালি জাতির স্রষ্টা'।

ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ও দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি, আপেক্ষিক মূল্যবোধ আর মানবমুক্তির সংগ্রাম-আন্দোলন ঔপনিবেশিক বর্ণবাদী দুনিয়ায় চেতনা-চিৎপ্রকর্ষের দ্বার উন্মোচন করেছে বটে। সেই ধারাবাহিকতায় কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ব্যতিক্রমী এক অনন্য সত্তা। তিনি ছিলেন চিন্তা-চেতনায় প্রচ্ছন্ন, সাহসে-শক্তিতে অনন্য, আপোশহীনতায় অটল-অনড়-অম্লান। তাই বুঝি কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ত্রো নির্দ্বিধায় বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি, তবে শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসে এই মানুষটি হিমালয়ের সমান। এভাবে আমি হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতাই লাভ করলাম।' এছাড়াও চিরজাগ্রত সাহসী পুরুষ বঙ্গবন্ধুকে শান্তির জন্য বিশ্বশান্তি পরিষদ ১৯৭২ সালের ১০ই অক্টোবর 'জুলিও কুরি' খেতাবে ভূষিত করে। পদক প্রদান অনুষ্ঠানে পরিষদের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল রমেশচন্দ্র বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলার নন, তিনি বিশ্বের এবং তিনি বিশ্ববন্ধু।' স্বাধীন বাংলাদেশের কোনো রাষ্ট্রনেতার সেটিই ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক পদক লাভ।

১৯৭৪ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি অর্জন শুধু বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিশ্ব দরবারে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার ফসল এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মতো একটি নবীনতম রাষ্ট্রের জন্য একটি বড়ো সাফল্য। বাংলাদেশের জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তি ও সদস্যপদ লাভে বঙ্গবন্ধুর নিরলস কূটনৈতিক তৎপরতা ও অসামান্য অবদান বাঙালি জাতির কাছে প্রাতঃস্মরণীয়।

১৯৭৪ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য দেশের মর্যাদা লাভের মাত্র সাতদিন পর ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন। জাতিসংঘে এটিই ছিল প্রথম বাংলায় ভাষণ। নিঃসন্দেহে জাতিসংঘে বাংলায় দেওয়া ভাষণ ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনে সুন্দরতম, স্মরণীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ দিন।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিশ্বপরিসরে এর আগে এমন করে বাংলা ভাষাকে কেউ পরিচয় করিয়ে দেননি যেমনটি বঙ্গবন্ধু করেছেন। বাঙালিদের অনেকেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখায় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়ে বিশ্বের দরবারে নিজেদের পরিচিত করলেও তাদের কেউ কখনো কোনো আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলা ভাষায় বক্তব্য রাখেননি। সে কারণে জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ভাষণে বাংলা ভাষা বিশ্বদরবারে পেয়েছে সম্মানের আসন। আর এই ভাষাভাষীর জনগণ পেয়েছে গর্ব করার মতো বিষয়।

বাঙালি জাতির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আত্মমর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে বাংলায় প্রদত্ত ওই ভাষণ অসাধারণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। তেমনি এ উদ্যোগ বাঙালির হাজার বছরের মায়ের ভাষা, স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলার পরিচিতির পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের একটি স্বীকৃত ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও বড়ো ভূমিকা রাখছে। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও চলতি ২০২১ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৭৬তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন। এবার নিয়ে তিনি মোট ১৭ বারের মতো জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ প্রদান করলেন।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ মুক্তিপাগল নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে যোদ্ধায় রূপান্তরিত করেছিল, তেমনি ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ১৩৬টি জাতিরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রতিনিধিদের সামনে মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দিয়ে বিশ্ববাসীকে অভিভূত করেছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৭ই মার্চের ভাষণটি ছিল বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের সংগ্রাম, স্বাধিকার আন্দোলনের প্রস্তুতি ও দিক নির্দেশনামূলক আর ২৫শে সেপ্টেম্বরের এই ভাষণটি ছিল বিশ্বের অধিকার বঞ্চিত,

নির্যাতিত এবং নিষ্পেষিত মানুষের ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বশান্তির জন্য বলিষ্ঠ উচ্চারণ ও সাহসী পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধুই প্রথম রাষ্ট্রনায়ক, যিনি জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন।

জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ভারতীয় উপমহাদেশের ভাষাগুলোর মধ্যে শুধু বাংলাই সারণি-স্বীকৃত ভাষা। বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪-এর সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে বাংলা ভাষার এই গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভাষার জন্যই ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি অমর একুশের ঐতিহাসিকতা অর্জন করে। এর ৪৮ বছর পর ১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বাঙালি জাতিকে একসময় যে আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হয়েছিল সেই আন্দোলনের রক্তের স্রোত ধারা আরও অনেক আত্মত্যাগ ও রক্তধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রমান্বয়ে মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানের রক্ত সাগরে মিলিত হয়ে বাংলার আকাশে স্বাধীনতার সূর্যোদয় সম্ভব করেছে। এভাবে ভাষার দাবির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন থেকে জাতিরাষ্ট্র অভ্যুদয়ের আন্দোলনকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ভাষাভিত্তিক বিশেষ করে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনের সঙ্গে বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত সুগভীর। বিশ্বে আর কোনো জাতিরাষ্ট্র ভাষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নজির নেই। তাই বাঙালি জাতিসত্তা, বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু একইসূত্রে গাঁথা।

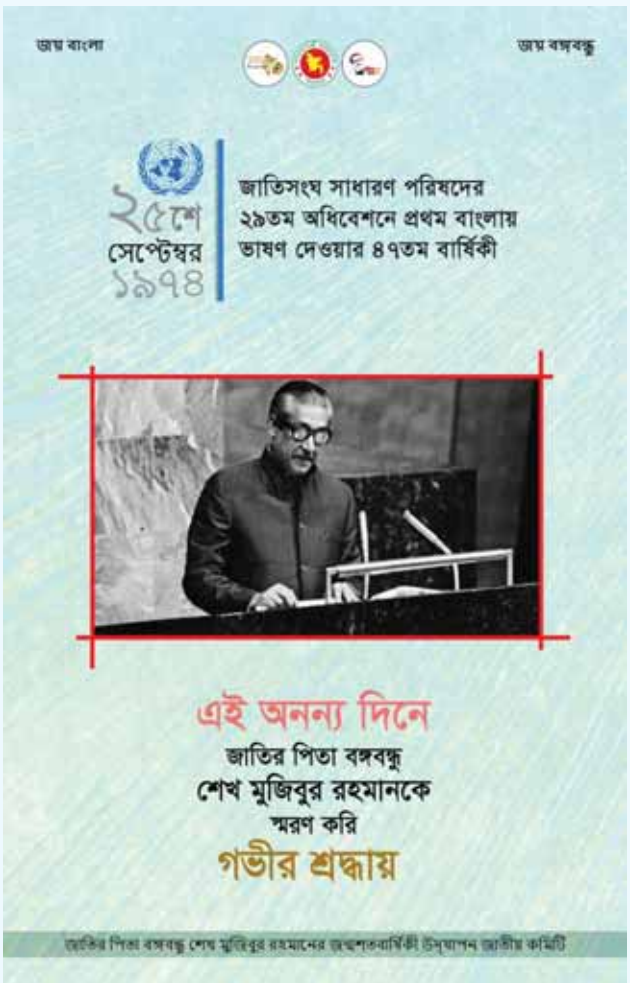

জাতিসংঘের নবীনতম সদস্যরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু বিশ্বের সকল জাতিরাষ্ট্রের সমাদৃত সংস্থা জাতিসংঘের অধিবেশনে বাংলা ভাষায় প্রথম ভাষণ দেওয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর সব দেশের মাঝে বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিসত্তার বিশ্বজনীন পরিচিতি ও বিস্তার ঘটান।

প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা, সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য জনাব তোফায়েল আহমেদের লেখা 'জাতিসংঘে জাতির পিতার বাংলা ভাষণ: ফিরে দেখা' নিবন্ধ থেকে জানা যায়–

জাতিসংঘ সেক্রেটারিয়েট থেকে বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ করা হয়েছিল, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি ইংরেজিতে বক্তৃতা করবেন।' প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার প্রতি সুগভীর দরদ ও মমত্ববোধ থেকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করতে চাই।' সিদ্ধান্তটি তিনি আগেই নিয়ে রেখেছিলেন। তিনি সাধু বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বাংলা বক্তৃতার ইংরেজি ভাষান্তর করার গুরুদায়িত্বটি অর্পিত হয়েছিল লন্ডনে তৎকালীন বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার ফারুক আহমেদ চৌধুরীর ওপর।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে চীনে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনেও বঙ্গবন্ধু মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করেছিলেন। তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের ২২৮ নং পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, 'আমি বাংলায় বক্তৃতা করলাম।... কেন বাংলায় বক্তৃতা করবো না? ... পূর্ব বাংলার ছাত্ররা জীবন দিয়েছে মাতৃভাষার জন্য! বাংলা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু লোকের ভাষা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে না জানে এমন শিক্ষিত লোক চীন কেন, দুনিয়ার অন্যান্য দেশেও আমি কম দেখেছি। আমি ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে পারি। তবু আমার মাতৃভাষায় বলা কর্তব্য।'

জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতার শুভসূচনা করেন এভাবে–

মাননীয় সভাপতি, আজ এই মহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এই জন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগিদার যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এই পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়া বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহারা বিশ্বের সকল জাতির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়া বাস করিবার জন্যে আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে সংরক্ষিত রহিয়াছে, আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তুলিবার জন্য

> বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের এই অঙ্গীকারের সহিত শহিদদের বিদেহী আত্মাও মিলিত হইবেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর সেই বক্তৃতায় আবশ্যকীয় দিকগুলো বাদ রাখেননি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ও মুক্তির সংগ্রামে যে যে দেশ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'যাহাদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিশ্ব সমাজে স্থান লাভ করিয়াছে, এই সুযোগে আমি তাহাদের অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সমর্থনকারী সকল দেশ ও জনগণের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ছিল শান্তির জন্য সংগ্রাম, জাতিসংঘ গত ২৫ বছর ধরে এই শান্তির জন্য সংগ্রাম করিয়া যাইতেছে।'

বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় জনগণের অধিকার কেড়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে দেশে দেশে সেনাবাহিনী ব্যবহারের তীব্র নিন্দা জানান এবং বাংলাদেশসহ চারটি দেশ আলজেরিয়া, গিনি বিসাউ এবং ভিয়েতনামের নাম উল্লেখ করে বলেন, 'এই দেশগুলি অপশক্তির বিরুদ্ধে বিরাট বিজয় অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।' বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে ফিলিস্তিন, জাম্বিয়া, নামিবিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গেও একাত্মতা ঘোষণা করেন। বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত, দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করেন। সে সময় বন্যায় বিপর্যস্ত বাংলাদেশ। দুর্গত মানুষের সহায়তার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের মতো জাতিসমূহ– যাদের অভ্যুদয় সংগ্রাম এবং ত্যাগের মধ্য দিয়ে তাদের অদম্য মানবীয় শক্তি রয়েছে।' বঙ্গবন্ধু দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'আমাদের কষ্ট হতে পারে কিন্তু আমাদের ধ্বংস নেই।'

বঙ্গবন্ধু ভাষণের শেষ পর্যায়ে এসে বেশ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, সম্মানিত সভাপতি, 'মানুষের অজেয় শক্তির প্রতি আমার বিশ্বাস রহিয়াছে। আমি বিশ্বাস করি, মানুষ অসম্ভবকে জয় করিবার ক্ষমতা রাখে।' বঙ্গবন্ধু উদাত্ত কণ্ঠে বলেন, 'অজয়কে জয় করিবার সেই শক্তির প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখিয়াই আমি আমার বক্তৃতা শেষ করিবো'। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন,

> বাংলাদেশের মতো সেইসব দেশ দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কেবল তাহাদেরই এই দৃঢ়তা ও মনোবল রহিয়াছে। মনে রাখিবেন সভাপতি, আমার বাঙালি জাতি চরম দুঃখ ভোগ করিতে পারে কিন্তু মরিবে না, টিকিয়া থাকিবার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমার জনগণের দৃঢ়তাই আমাদের প্রধান শক্তি।

দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠনে, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিশ্ব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বাঙালি জাতির সঙ্গে বিশ্ববাসীকেও আগামী দিনগুলোতে অনুপ্রাণিত করবে।

জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আলজেরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি) আবদুল আজিজ বুতাফ্লিকা। বক্তা হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অধিবেশনের সভাপতি স্বীয় আসন থেকে উঠে এসে বঙ্গবন্ধুকে মঞ্চে তুলে নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণ শুরু করেন নিউইয়র্ক সময় বিকাল ৩টায় এবং বাংলাদেশ সময় রাত ১টায়। যখন বক্তৃতা প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধুর নাম ঘোষিত হয়, তখন বিশ্বনেতৃবৃন্দের মুহুর্মুহু করতালিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে চারপাশে তাকিয়ে বিশ্বনেতৃবৃন্দকে সম্বোধন করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সর্বোচ্চ সংস্থা জাতিসংঘকে 'মানব জাতির মহান পার্লামেন্ট' উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন। পিনপতন নিস্তব্ধতার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৪৫ মিনিট বক্তৃতা শেষে সভাপতি নিজেই যখন দাঁড়িয়ে করতালি দিচ্ছিলেন, তখন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও প্রতিনিধি দলের সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপুল করতালির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দিত করেছিলেন। সাধারণ পরিষদের অধিবেশন উপলক্ষে প্রকাশিত জাতিসংঘের 'ডেলিগেট বুলেটিন' বঙ্গবন্ধুকে 'কিংবদন্তির নায়ক মুজিব' বলে আখ্যায়িত করে। বুলেটিনটিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের প্রদত্ত মন্তব্য-প্রতিক্রিয়া পত্রস্থ করা হয়।

বাংলাদেশের মানুষকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে ক্ষুধা-দারিদ্র্য আর পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে সভ্যতার দিকে ধাবিত হওয়ার মন্ত্রণা দান এবং বিশ্বায়নের নামে অর্থনৈতিক আগ্রাসন আর মানবাধিকার হরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মানবমুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু সোনালি স্বপ্নের জাল বুনতেন। যে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ বঙ্গবন্ধুকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবেসে, তাঁর অঙ্গুলির ইশারায় গোটা বাঙালি জাতি স্বাধীনতার জন্য শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দিয়ে পরম আরাধ্যের প্রিয় স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে এনেছে এবং সর্বোপরি বিশ্বের দরবারে বাঙালি জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছে একমাত্র বঙ্গবন্ধুর জন্যই। আর ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ প্রদান করে বিশ্ববাসীর কাছে যে নজির স্থাপন করেছেন, তা চির অম্লান ও প্রেরণাদায়ক।

ড. আবদুল আলীম তালুকদার: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহকারী অধ্যাপক, শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর, dr.alim1978@gmail.com

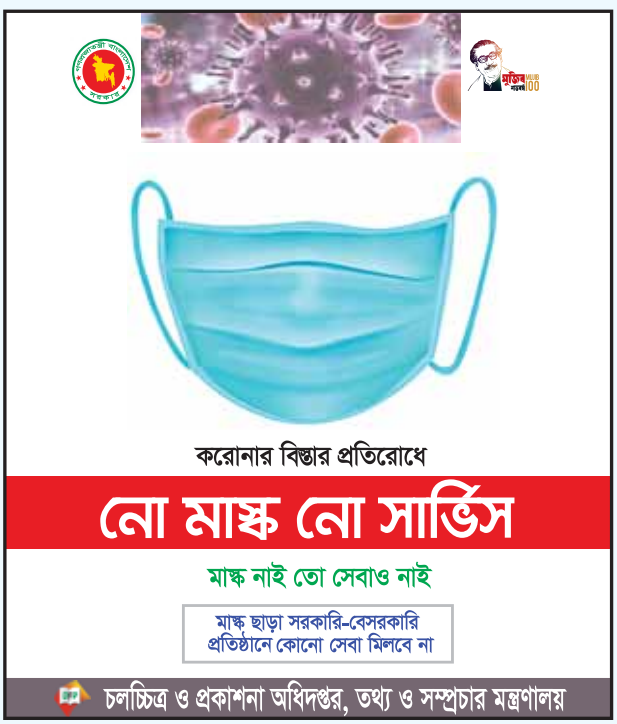

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই অক্টোবর ২০২১ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সিপিপির ৫০ বছরে পদার্পণ ও আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন ও সিপিপির ভূমিকা

ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ

প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ, অতিরিক্ত জনবসতি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট তীব্র আকার ধারণ করবে তা দূরদর্শী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর সরকার ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানুষের জীবন, সম্পদ এবং গবাদি পশু রক্ষার জন্য 'মুজিব কিল্লা' নির্মাণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু দুর্যোগ মোকাবিলায় জাতীয় বাজেটে ১৯৭২-১৯৭৫ সময়ে গড়ে মোট বাজেটের শতকরা ১১ ভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বরাদ্দ রেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, জাতির পিতার দূরদৃষ্টি এবং গতিশীল নেতৃত্ব এখনও বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীতি, কৌশল এবং কার্যক্রমের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। প্রযুক্তি ও পূর্ব প্রস্তুতির কারণে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ অতিমারির মধ্যেও ২০২০ সালে সুপার ঘূর্ণিঝড় 'আম্ফান'-এ প্রাণহানি ঘটেছে মাত্র ১৫ জনের। এ দুই মহাদুর্যোগ সফলতার সঙ্গে মোকাবিলা করে বিশ্বদরবারে প্রশংসিত হয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় গোর্কির আঘাতে পাঁচ লাখের অধিক মানুষ প্রাণ হারায় এবং ব্যাপক সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্নির্মাণের অংশ হিসেবে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে একটি কার্যকর 'সাইক্লোন প্রিপিয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম (সিপিপি)' বাংলায় 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)' গঠন করেন। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার পথিকৃৎ বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর সংস্কৃতি সৃষ্টিতে বিশেষ করে দুর্যোগ মোকাবিলায় উদ্ভাবিত 'মুজিব কিল্লা' নির্মাণের ধারণা ও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ইতিহাসে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত। অনেক দেশ সিপিপির মডেলকে অনুসরণ করছে। সারা বিশ্বে এটি অতি প্রশংসিত ও সমাদৃত। দুর্যোগ সংক্রান্ত বিশ্বে প্রায়শই সফল কার্যক্রম হিসেবে সিপিপিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা হয়।

এই সিপিপির দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সঠিক ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেটি জানতে এবং বুঝতে হলে সিপিপির জন্মের ইতিহাসও একটু জানা দরকার। ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বরের গোর্কি পৃথিবীর লিখিত ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ সাইক্লোন। এরপরই লিগ অব রেডক্রস সোসাইটিকে বিশেষ নিমিত্ত একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘ একটি বিশেষ সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করে। ১৯৭০ সালের সাইক্লোন এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য সেসময় অনেক দেশের রেডক্রসের প্রতিনিধি এদেশে আসেন এবং অনেক প্রকল্প শুরু করেন। এর মধ্যে সুইডেন থেকে সাইক্লোন রিলিফ ডেলিগেট হিসেবে এসেছিলেন মিস্টার ক্লাস হেগস্ট্রম। তখন এদেশে আবহাওয়া অধিদপ্তর, রাডার স্টেশন সরকারি প্রশাসনের মাধ্যমে সাইক্লোনের আগাম সংকেত প্রচারকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা থাকার পরও কেন লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি হলো, সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য তিনি বহুদিন উপকূলবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চলে থেকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

ঐতিহাসিক তথ্য এবং পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের কারণে চরম ঝুঁকিতে আছে। ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমির বৈশিষ্ট্য, নদী সংখ্যাধিক্য ও বর্ষার কারণে বাংলাদেশ নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশের উপকূলীয় ভূমিরূপ এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিশেষ করে এ দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপকূলীয় বাসিন্দাদের ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে তুলছে। বাংলাদেশের প্রধান দুর্যোগসমূহ হলো– বন্যা, ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, নদীর তীরভাঙন, খরা, ভূমিকম্প এবং শহরের বস্তি, বাজার ও উঁচু দালানগুলোতে অগ্নিকাণ্ড। বাংলাদেশ সরকার, উন্নয়ন অংশীদার, এনজিও, সিবিও, বেসরকারি খাতসহ সংস্থাগুলো এবং দেশের মূল স্টেকহোল্ডারগণ জনসংখ্যা,

সমাজ, অর্থনীতি, বাস্তুতন্ত্র এবং অবকাঠামোতে দুর্যোগের ধরন, গতিশীলতা এবং প্রভাবগুলোর বিষয়ে অবগত আছেন। বাংলাদেশ সরকার জাতীয় দুর্যোগ নীতি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বর্তমানে প্রচলিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মডেল (যেমন জরুরি সাড়া প্রদান, ত্রাণ এবং পুনরুদ্ধার) দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের আরও একটি সামগ্রিক পদ্ধতির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, যেখানে দুর্যোগ শনাক্তকরণ এবং প্রশমন প্রক্রিয়া, জনগোষ্ঠীর প্রস্তুতি, সমন্বিত সাড়া প্রদানের প্রচেষ্টা এবং পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা অনুসরণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কাঠামোগত ও অবকাঠামোগত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। যেমন– দুর্যোগাক্রান্ত এলাকায় 'মুজিব কিল্লা' তৈরি ও সংস্কার; ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি; গৃহনির্মাণ, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন; নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষায় বিশেষ দৃষ্টি দেওয়াসহ সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম ও পদক্ষেপ। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীকে সামনে রেখে ৮৬,৯৯৬টি দুর্যোগ সহনশীল গৃহনির্মাণ। এরই মাঝে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে (১৩ই অক্টোবর ২০২০) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭,০০০ বাড়ি উদ্‌বোধন করেন। মন্ত্রণালয় বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, যার মধ্যে জাতির পিতার চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন দেখা যায়। ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম; গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মা ও পাঁচ বছর বয়সি শিশুদের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ কর্মসূচি; ইমার্জেন্সি মাল্টিসেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক সাড়াভিত্তিক অন্যতম পরিকল্পনা কেন্দ্র বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলি (২০১৯) হালনাগাদ করে প্রথমবারের মতো জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ কমিটিতে পানি সম্পদ, জলবায়ু পরিবর্তন, ভূমিকম্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক খাতভিত্তিক বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য কৌশলগত পরিকল্পনাটি দুর্যোগের ঘটনা ও তীব্রতা হ্রাস করতে টেকসই উন্নয়নের জন্য একীভূত দুর্যোগ পদ্ধতির ওপর জোর দিয়ে, নীতি এবং ডিআরআর (২০১৫-২০৩০)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। দুর্যোগ প্রস্তুতির পাশাপাশি অধিকতর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য বিপন্ন জনগোষ্ঠী এবং স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে চেষ্টা এবং বিনিয়োগ বাড়ানো হয়েছে। সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক চারটি মূল ক্রিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। যথা: (ক) দুর্যোগ ঝুঁকি বোঝা (খ) দুর্যোগ ঝুঁকিগুলো পরিচালনা করতে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশাসনকে শক্তিশালী করা (গ) স্থিতিস্থাপকতার জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিনিয়োগ এবং (ঘ) পুনরুদ্ধার, পুনর্বাসন এবং পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে বিল্ড ব্যাক বেটার-এর কার্যকর সাড়া প্রদানের জন্য দুর্যোগের প্রস্তুতি বাড়ানো। এ জাতীয় অগ্রাধিকারগুলো বাংলাদেশের জাতীয় দুর্যোগ নীতি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনায় প্রতিফলিত ও সংযুক্ত করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখায় 'জাতির পিতায়' পরিণত হয়েছেন। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পর তিনিই এদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ভিত রচনা করে গেছেন, যা পর্যায়ক্রমে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও উদ্যোগেই স্বাধীন বাংলাদেশে রোপিত হয়েছিল দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বীজ। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরও সুদৃঢ় করেছেন। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে দুর্যোগ-পূর্ব প্রস্তুতি ও সাড়াদান কার্যক্রম জোরদার করার ফলে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি বিশেষ করে প্রাণহানির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বে রোল মডেল।

প্রতিবছর ১৩ই অক্টোবর আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন দিবস পালিত হয়ে থাকে। চলতি বছরেও বিশ্বের প্রতিটি দেশে এ দিবস পালিত হয়। তবে আমাদের জন্য আনন্দের খবর হচ্ছে, এসময়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর চিন্তাপ্রসূত সিপিপির ৫০তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি। মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও অধস্তন দপ্তরগুলোতে সিপিপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষেও বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। চলতি বছরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন দিবসের প্রতিপাদ্য– 'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে, কাজ করি একসাথে'। এছাড়া 'মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি, জোরদার করি দুর্যোগ প্রস্তুতি'– এ জাতীয় স্লোগানের শক্তিতে সিপিপির ৭৬,০০০ ভলান্টিয়ারস এবং সারা দেশে তৃণমূল পর্যায়ে আনসার-ভিডিপি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবী কর্মী কন্টিজেন্সি পরিকল্পনায় দুর্যোগ প্রস্তুতিতে সক্রিয় থেকে জাতিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। বিশ্ব এখন আমাদের কার্যক্রমে জয়ধ্বনি তুলছে এবং আমাদেরকে অনুসরণ করছে। আসুন, অগ্রগতির এ ধারাকে অব্যাহত রেখে এ বছরের ঘোষিত প্রতিপাদ্য ও মূলসুরে সুর মিলিয়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সফল দাবিদার হিসেবে বিশ্বে আমাদের দেশকে তুলে ধরি।

ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ: কলামিস্ট ও গবেষক, সাবেক উপ-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার-ভিডিপি, forqan.info@gmail.com

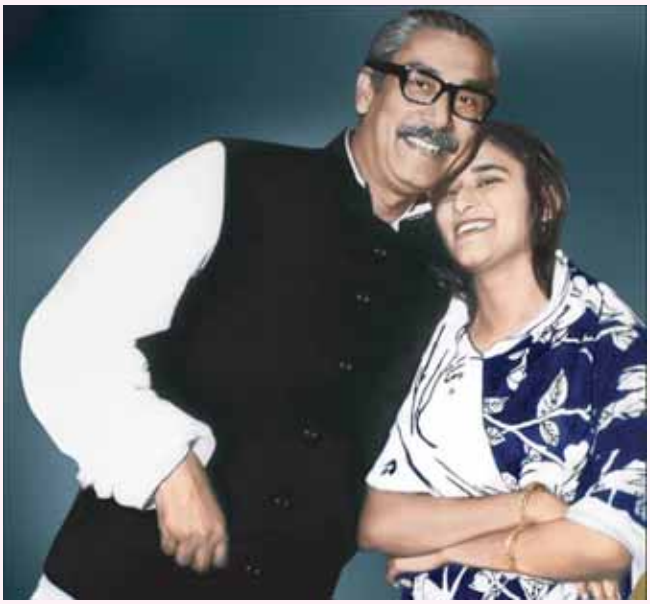

বঙ্গবন্ধুর গ্রামীণ উন্নয়ন ভাবনা ও বঙ্গবন্ধুকন্যার গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যক্রম

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ একজন স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন চিন্তাবিদ ও পরিবেশকর্মী। তিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবিধানিক ইনস্টিটিউট ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিক্স-এর সভাপতি এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সভাপতি। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সমাজসেবা ও জনসেবায় অনন্য অবদানের জন্য ২০১৯ সালে সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা স্বাধীনতা পুরস্কার এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অবদানের জন্য ২০০৯ সালে একুশে পদকে ভূষিত করে। তিনি অর্থনীতি বিষয়ে ১৯৬১ সালে ব্যাচেলর ডিগ্রি ও ১৯৬২ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। পরে তিনি লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং মুজিবনগর সরকারের অধীনে পরিকল্পনা সেলে কর্মরত ছিলেন। ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বর্তমানে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনের গঠনতন্ত্রের বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তি দলের সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করছেন। তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ ও রিপোর্টের সংখ্যা দুইশ পঞ্চাশের বেশি। দেশে ও বিদেশে একক এবং যৌথভাবে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ৪০টি। তিনি শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নে কঠোর পরিশ্রম, গবেষণা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকার পক্ষ থেকে বিডিবিএল-এর অবসরপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক ও অর্থনীতি বিষয়ক কলাম লেখক এম এ খালেক 'বঙ্গবন্ধুর গ্রামীণ উন্নয়ন ভাবনা ও বঙ্গবন্ধুকন্যার গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যক্রম' বিষয়ে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

এম এ খালেক: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতি ও দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সাধারণ মানুষ। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্যই তিনি রাজনীতি করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাভাবনা কী ছিল?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: আপনি ঠিকই বলেছেন, বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছেন সাধারণ মানুষের কল্যাণ চিন্তা করে। দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র সাড়ে তিন বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি এমন একটি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন, যা ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং সার্বিকভাবে বিপন্নপ্রায় অর্থনীতি সংবলিত একটি দেশ। রাস্তাঘাট ছিল না, ব্রিজ-কালভার্ট ছিল না। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বিধ্বস্ত। কৃষি ব্যবস্থাও স্থবির হয়ে পড়েছিল। শিল্পকারখানা বন্ধ ছিল। উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধকাল থেকেই। প্রশাসনিক ব্যবস্থাও একটি স্বাধীন দেশের উপযোগী ছিল না। কোনো সংবিধানও ছিল না। বিদেশের স্বীকৃতিও তেমন একটা ছিল না। যে-কোনো নেতার পক্ষে এই অবস্থায় বিহ্বল হয়ে পড়ার কথা। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তো বঙ্গবন্ধুই। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। অবশ্য বঙ্গবন্ধু আগে থেকেই জানতেন, দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনেই বেশি জোর দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের পর উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করেন মানুষকে কেন্দ্র করে। প্রথমেই তিনি ভারত থেকে ফিরে আসা এক কোটি মানুষকে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ভারতফেরত এসব মানুষের খাদ্য-আশ্রয় কিছুই ছিল না। এমনকি যারা দেশের অভ্যন্তরে ছিলেন তাদেরও অবস্থা ছিল বিধ্বস্ত। তিনি প্রথমেই এসব বিপন্নপ্রায় মানুষের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করেন। বিষয়টি আমি ভালোভাবে জানি, কারণ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম দুই মাস আমি ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলাম। কাজেই খুব ঘনিষ্ঠভাবে ত্রাণ কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। আমি নিজেও বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম দেখতে যেতাম। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষ যাতে আবারও উঠে দাঁড়াতে পারে।

এম এ খালেক: স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী দেশের রাস্তাঘাট তথা অবকাঠামো প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। বঙ্গবন্ধু অবকাঠামোগত উন্নয়নে কী করেন?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: একটি দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে অবকাঠামো খাতের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। বঙ্গবন্ধু বিষয়টি অত্যন্ত ভালোভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তাই তিনি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই দেশের বিধ্বস্ত অবকাঠামো উন্নয়নে মনোযোগ দেন। গ্রামের রাস্তাঘাট ছিল বিধ্বস্ত। শহরের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো ছিল না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হয়। রাস্তাঘাট পুনর্নির্মাণ করা হয়। অনেকগুলো নতুন রাস্তা নির্মিত হয়। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটাই উন্নত হয়।

এম এ খালেক: বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। বঙ্গবন্ধু কৃষির উন্নয়নে কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: বঙ্গবন্ধু মাটি ও মানুষের রাজনীতিবিদ হিসেবে এটা ভালো করেই জানতেন যে, কৃষির উন্নয়ন ঘটানো না গেলে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে না। তাই তিনি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের পর কৃষির উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পাবার পরই বঙ্গবন্ধু কৃষকদের মামলার জট থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পাকিস্তান আমলে কৃষকের বিরুদ্ধে ব্যাংকগুলো ১০ লাখ মামলা দায়ের করেছিল। বঙ্গবন্ধু প্রথমেই সেই সব সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার করেন। তিনি গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জন্য টেস্ট রিলিফের টাকা দিলেন। কৃষকদের জন্য ঋণদানের ব্যবস্থা করা হলো। সমবায় ঋণদানের ব্যবস্থা করা হলো। এসব ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল– কৃষক যাতে আবারও পূর্ণোদ্যমে

কৃষি কাজ শুরু করতে পারে সেই ব্যবস্থা করা। কৃষকদের বীজ-সার এবং কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। এমনকি সেচের জন্য বাইরে থেকে কিছু যন্ত্রপাতি আনার ব্যবস্থা করা হলো। কৃষির উন্নয়নে শেষে তিনি যেটা করলেন, তাহলো– সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন। প্রত্যেক গ্রামে একটি করে সমবায় সমিতি গঠিত হবে। এটা ছিল বাকশালের কনসেপ্ট। গ্রামে যে কৃষি কার্যক্রম পরিচালনা হবে বা শিল্পকারখানা স্থাপিত হবে, তা হবে এই সমবায় সমিতির আওতায়। গ্রামের সবাই উৎপাদন এবং বিপণন কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। কারো জমি বা সম্পদ কেড়ে নেওয়া হবে না। কিন্তু উৎপাদন কার্যক্রমের সুফল সবাই ন্যায্যতার ভিত্তিতে ভোগ করতে পারবে– এটাই ছিল সমবায় ব্যবস্থার মূলমন্ত্র। যাদের জমি আছে তারা জমির মালিকানার বিপরীতে উৎপাদনের অংশ পাবেন। যারা শ্রম দেবে তারা তাদের শ্রমের মূল্য পাবেন। আর সমবায় সমিতি উৎপাদনের একটি অংশ পাবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সমবায়ের মাধ্যমে যে উৎপাদন হবে তার একটি অংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে। সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে প্রতি খণ্ড জমি আবাদের আওতায় নিয়ে আসার ইচ্ছে ছিল বঙ্গবন্ধুর। এমনকি তিনি সমবায় ফান্ড গঠনের কথাও চিন্তা করেছিলেন। সমবায় সমিতির মাধ্যমে যে আয় হবে তার একটি অংশ এই ফান্ডে জমা হবে এবং সরকারও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বাজেট থেকে এই ফান্ডে দেবে। ফান্ডের অর্থ কৃষি উন্নয়নে কাজে লাগানো হবে।

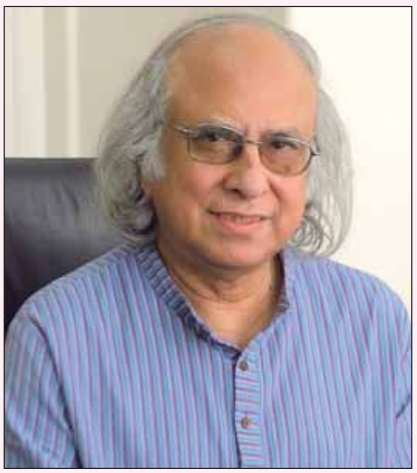

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

কৃষি খাতে বঙ্গবন্ধু সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুফ করে দেওয়া এবং পরিবারপ্রতি জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সিলিং ১০০ বিঘা নির্ধারণ করে দেওয়া। এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য– কৃষিজমি যাতে সামান্য কিছু পরিবারের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়। কৃষকদের বকেয়া খাজনার ওপর যে সুদ আরোপ করা হয়েছিল তা মওকুফ করে দেওয়া হয়। সেই সময় দেশের মোট জনসংখ্যার ৯২ শতাংশ গ্রামে বাস করত। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি, দর্শন ও উন্নয়ন সবকিছুর মূলেই ছিল মানুষ।

এম এ খালেক: বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষি তথা সার্বিক অর্থনীতির জন্য জলবায়ু পরিবর্তন নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বঙ্গবন্ধু কি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে বহুমুখী আলোচনা হচ্ছে। বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সত্তরের দশকে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে তেমন কোনো সচেতনতা বিশ্বব্যাপী ছিল না। কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, বঙ্গবন্ধু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বৃক্ষরোপণের কথা বলেন। নিজে বিভিন্ন স্থানে গাছের চারা রোপণ করেছেন। ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তিনি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনায়নের গুরুত্বের কথা বলেন। এমনকি বঙ্গবন্ধু উপকূলীয় বনায়নের কথাও বলেন। উপকূলীয় বনায়নের বিষয়টি তখনো ছিল অনেকটাই মানুষের জানার বাইরে।

এম এ খালেক: ১৯৭৪ সালের ৩০শে অক্টোবর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ঢাকায় সাক্ষাৎ হয়। এই সময় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমরা যদি আমাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি তাহলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে খাদ্যসংকট কাটিয়ে উঠতে পারব'। একইসঙ্গে আরও বলেন, 'কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা খাদ্য উৎপাদন তিনগুণ করতে পারব'– এই বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী কীভাবে ও কীসের ভিত্তিতে করেছিলেন?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: বাংলাদেশের কৃষকদের ওপর বঙ্গবন্ধুর অগাধ বিশ্বাস এবং আস্থা ছিল। বঙ্গবন্ধু যে সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবায়নের সুযোগ পেলে এই অর্জন মোটেও অসাধ্য ছিল না। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি এবং প্রতিটি হাতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে। আর এটা করা গেলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া এবং উৎপাদন তিনগুণ বাড়ানো কোনো ব্যাপার ছিল না। তিনি সমবায়ের মাধ্যমে চাষযোগ্য জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশের জমি খুবই উর্বর। বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। চালের উৎপাদন ১৯৭২-১৯৭৩ সালের তুলনায় প্রায় চারগুণ বেড়েছে। বঙ্গবন্ধুর সেদিনের আত্মপ্রত্যয় যে মিথ্যে ছিল না তা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনা ছিল এবং সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মতো পদ্ধতিও তাঁর জানা ছিল।

এম এ খালেক: বঙ্গবন্ধু গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন, বর্তমান সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন পকিল্পনার সঙ্গে তার মিল কতটুকু?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: বঙ্গবন্ধু দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন বর্তমান সরকার তার সূত্র ধরে দেশকে ইতোমধ্যেই খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছে। বর্তমান সরকার হচ্ছে কৃষিবান্ধব সরকার। সরকারি পরিকল্পনায় কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৯৭২-১৯৭৩ সালে দেশের মানুষের সংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। বর্তমানে জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৭০ লাখে উন্নীত হয়েছে। সেই সময় দেশে বার্ষিক খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ কোটি মেট্রিক টন, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে তা ৪ কোটি ১৩ লাখ ২৫ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। পরবর্তী তিন বছরে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ বাড়িঘর নির্মাণ, রাস্তা তৈরি, কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদি কারণে জমির পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমেছে। বর্তমান সরকার কৃষি খাতে রাষ্ট্রীয় সহায়তা প্রদান করে চলেছে। কৃষকদের ভরতুকি মূল্যে কৃষি উপকরণ (বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি) দেওয়া হচ্ছে। সারের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে কমানো হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকায়ন ইতোমধ্যেই ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকালে এবং পরবর্তীতে ২০০৯ সাল থেকে অদ্যাবধি কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই কার্যক্রম বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথেই এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা ২০২০ সালেই খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বৈশ্বিক মহামারি করোনা বিদ্যমান সত্ত্বেও স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক

ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ যথেষ্ট উন্নতি করেছে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলো থেকেও এগিয়ে।

এম এ খালেক: শহরের সুবিধা গ্রামে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বর্তমান সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার নিয়ে কিছু বলবেন? এটা কি বঙ্গবন্ধুর দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: অবশ্যই। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নতি করতে। বর্তমান সরকারও সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। গ্রামে পাকা রাস্তা নির্মিত হয়েছে। অধিকাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমান সরকার শহরের সুবিধা গ্রামে নিয়ে যেতে চায়। গ্রামের মানুষ যাতে শহরের সব সুবিধা ভোগ করতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে শহরের অনেক সুবিধা গ্রামে নেওয়া হয়েছে। গ্রামের চিরাচরিত রূপ অপরিবর্তিত থাকবে। শুধু শহরের সুবিধাগুলো সেখানে সম্প্রসারিত করা হবে।

এম এ খালেক: বর্তমান সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়নের যে উদ্যোগ নিয়েছে তার প্রায় সবগুলোই পল্লি এলাকায় স্থাপিত হবে। এটা গ্রামীণ উন্নয়নে কতটা অবদান রাখবে বলে মনে করেন?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন টেকসই করার লক্ষ্যে শিল্পায়নের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। শিল্প স্থাপনের উপযুক্ত জমির অভাব পূরণ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সবার জন্য অবারিত করার লক্ষ্যেই সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কৃষি খাত থেকে যে কাঁচামাল আসে তা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে অধিকতর উপযোগী করে তোলার জন্য শিল্পায়নের কোনো বিকল্প নেই। এছাড়া আগামীতে কৃষি যান্ত্রিকায়ন হলে এই খাতের উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হলে সেখানে মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে গ্রামের সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এই যে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হচ্ছে তাতে একটি শর্তারোপিত রয়েছে তাহলো– উর্বর কৃষিজমিতে এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হতে পারবে না। ইতোমধ্যে যে কয়টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, তার কোনোটিই উর্বর কৃষি জমিতে স্থাপিত হচ্ছে না। প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলই হবে বিশাল আকারের। যদিও সেখানে ছোটোবড়ো সব ধরনের শিল্পকারখানাই স্থাপিত হবে। এই অর্থনৈতিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আশপাশে অনেক ধরনের উদ্যোগ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে উন্নয়ন ঘটবে তাতে অনেক মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। সরকার কৃষিকেন্দ্রিক শিল্পায়ন করতে চাচ্ছে। কৃষিকেন্দ্রিক শিল্পায়ন বলতে দুটো বিষয়কে বুঝানো হচ্ছে। প্রথমত, এমন শিল্প স্থাপন করা যাতে কৃষি উপকরণ তৈরি হবে। আবার এমন সব শিল্প স্থাপন করা যার কাঁচামাল আসবে কৃষি খাত থেকে। সরকার এই দুটি বিষয়কে সমন্বিত করার চেষ্টা করছে। একইসঙ্গে সরকার গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করছে। বঙ্গবন্ধু ব্যক্তি মালিকানায় এ ধরনের ছোটো ছোটো উদ্যোগকে উৎসাহিত করেছিলেন।

এম এ খালেক: আপনি উপযুক্ত ঋণ নামে একটি বিশেষ পদ্ধতির ঋণদানের কথা প্রায়শই বলে থাকেন। এটা গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে কতটা কার্যকর বলে মনে করেন?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: ক্ষুদ্রঋণ মানুষের আয় কিছুটা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করে ঠিকই কিন্তু টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে এই কার্যক্রম তেমন একটা সহায়ক নয়। স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক অনেক গবেষণায় এটা প্রতীয়মান হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ দেওয়া হয় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে। যেমন, হয়ত মাছ চাষের জন্য দেওয়া হলো ১০ লাখ টাকা। সবাইকে একই পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়। কিন্তু কারো ক্ষেত্রে হয়ত মাছ চাষ করতে ২০ লাখ টাকা প্রয়োজন হয়। সেখানে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাকে অবশিষ্ট ১০ লাখ টাকা সংগ্রহ করার জন্য অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের নিকট যেতে হবে। এভাবে একাধিক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে গিয়ে এক সময় উদ্যোক্তা ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েন। আর উপযুক্ত ঋণ হচ্ছে সেটাই যেখানে একজন উদ্যোক্তার প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণের জোগান দেওয়া হয়। এছাড়া উদ্যোক্তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং বাজারজাতকরণে সহায়তা দেওয়া হয়। উদ্যোক্তা যদি একটি মাত্র সূত্র থেকে তার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারে তাহলে তার সমস্যা কম হবে। আর্থিক ভিত শক্ত হবে। শিল্প স্থাপনের জন্য যে অর্থায়ন প্রয়োজন তার জোগান দেওয়া হলেও এখনো চলতি মূলধন ঋণ পাবার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। আমরা পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) থেকে চলতি মূলধন প্রাপ্তির ওপর জোর দিচ্ছি।

এম এ খালেক: নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বর্তমান সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব পদক্ষেপ গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে কতটা অবদান রাখছে বলে মনে করেন?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে সরকার। নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। নারী উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকি করা খুবই প্রয়োজন। ব্যাংকগুলো ঋণ দিয়েই তাদের দায়িত্ব শেষ করে। তারা ঋণদান এবং ঋণের কিস্তি আদায় করাকেই তাদের দায়িত্ব মনে করেন। কিন্তু পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ঋণ দিয়েই তার দায়িত্ব শেষ করে না। সেই ঋণের অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না, তারা পণ্য উৎপাদনের পর তা ঠিকভাবে বাজারজাত করতে পারছে কি না– তাও তদারকি করা হয়। একইসঙ্গে নারী উদ্যোক্তাদের দীর্ঘমেয়াদে সফল হওয়ার জন্য উপযুক্ত এবং কার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট স্থানে একই রকম অনেকগুলো শিল্প স্থাপিত হলে সেখানে নজরদারি করা সহজ হয়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে এম এ খালেক: বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল)-এর অবসরপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক ও অর্থনীতি বিষয়ক কলাম লেখক, khaleque09@yahoo.com

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
পাবলিক প্লেসে ধূমপান দণ্ডনীয় অপরাধ।

জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলচ্চিত্রের মহাকবি সত্যজিৎ রায়

অনুপম হায়াৎ

এই প্রবন্ধের সূত্রপাত করতে চাই বিশ্ববরেণ্য বাঙালি চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে দুটি তথ্যের উল্লেখ করে।

এক. চলচ্চিত্রে অবদান রাখার জন্য সত্যজিৎ রায়কে ১৯৮৭ সালে ফরাসি সরকার ঐ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'লিজিয়ন অব অনার' প্রদান করে। দুই. ১৯৮৯ সালে ফ্রান্সের একটি সংস্থা কর্তৃক সত্যজিৎ রায়কে সেরা বিদেশি গ্রন্থের জন্য বিশেষ পুরস্কার প্রদান করে।

সত্যজিৎ রায়ের ডাক নাম মানিক। আসলেই তিনি ছিলেন চলচ্চিত্র ও বই তথা সাহিত্যেরও 'মানিক'।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশজন চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জের মসুয়া গ্রামের রায় চৌধুরী পরিবারের সন্তান সত্যজিৎ রায় একজন (১৯২১-১৯৯২)। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিদেরও একজন। জন্মশতবর্ষে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলাদেশ, ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই অনন্য প্রতিভাধর ব্যক্তির জীবনকর্ম ও সাধনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে।

চলচ্চিত্রকার হিসেবে সুখ্যাতির পাশাপাশি তাঁর রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা এবং চিন্তা-মননকর্ম ও সৃজনশীলতায় জড়িয়ে আছে বই। তাঁর বংশগত ঐতিহ্যধারায় পূর্বপুরুষদেরও রয়েছে বই সংশ্লিষ্টতা। তাঁর দাদা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫) এবং পিতা সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) উভয়েই ছিলেন সাহিত্যিক, সুলেখক, আলোকচিত্রী, সম্পাদক। তাঁদের বিভিন্ন লেখা আজও শিশু-কিশোর-বয়স্কদের আনন্দ দেয় সমান্তরালে। সত্যজিৎ রায় তাঁদের লেখা নিয়ে চলচ্চিত্রও নির্মাণ করেছেন।

প্রতিভার বরপুত্র সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র নির্মাণের পাশাপাশি লিখেছেন অনেক বই। তিনি শুধু লেখক নন, তিনি বইয়ের প্রচ্ছদকার, অলংকরণবিদ এবং পৃষ্ঠপোষকও। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় (ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, স্প্যানিশ ইত্যাদি) এবং উপমহাদেশের (বাংলা, হিন্দি, অহমিয়া, মারাঠি, উর্দু, মালয়লাম ইত্যাদি) ভাষায় তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক গ্রন্থ/বই। তাঁর লেখা বই এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, ফিল্ম ইনস্টিটিউটে যেমন পঠিত এবং ফিল্ম আর্কাইভ ও লাইব্রেরিতেও রক্ষিত। বলা যায়, চলচ্চিত্রের পাশাপাশি তাঁর বইও সূর্যের বিচ্ছুরিত আলো ছড়ায়।

চলচ্চিত্রের মহাকবি

সত্যজিৎ রায়ের জন্ম ১৯২১ সালের ২রা মে কলকাতায়। আড়াই বছর বয়সের সময় পিতা সুকুমার রায়কে হারান তিনি। অতঃপর মা সুপ্রভার আদরস্নেহ-অভিভাবকত্ব ও মামাদের আশ্রয়ে তিনি বড়ো হন। তাঁর মা দিনরাত পরিশ্রম করে স্কুলে সেলাইয়ের কাজ করে সন্তান মানিককে সুশিক্ষিত করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজের গলার হার বিক্রি করে পুত্রের চলচ্চিত্র *পথের পাঁচালী* (১৯৫৫) নির্মাণের টাকার জোগান দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্য নজির স্থাপন করেন।

জানা যায়, শৈশব-কৈশোরে সত্যজিৎ রায় লেখাপড়ার পাশাপাশি মুখে মুখে ছড়া ও কবিতা পড়তেন। ছবি তুলতেন, গান গাইতেন, রেকর্ডে গান শুনতেন।

শান্তিনিকেতনে শিক্ষার সময় তিনি রবীন্দ্র সান্নিধ্য পান এবং লাইব্রেরিতে অজস্র বইয়ের সাথে পরিচিত হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় ইংরেজিতে লেখালেখি করেন। পরবর্তীকালে তিনি একটি সংস্থায় কাজ করার সময় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *পথের পাঁচালী* উপন্যাসের কিশোর সংস্করণ *আম আঁটির ভেঁপু* নামক গ্রন্থের সচিত্রকরণ করেন। এই কাজ করতে গিয়েই তাঁর বোধ, মনন, সৃজনে *পথের পাঁচালী* আলোড়ন তোলে। বিলেতে যাত্রার সময়ও তিনি এই গ্রন্থ নিয়ে চিত্রনাট্য রচনার খসড়া তৈরি করেন। বিলেতে অবস্থানকালে তিনি ৯৫টি ধ্রপদী চলচ্চিত্র দেখে নিজেকে ঋদ্ধ করেন। অতঃপর দেশে ফিরে ১৯৪৮ সাল থেকে চলচ্চিত্র সংসদ চর্চা, বিজ্ঞাপনভিত্তিক চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনা এবং কলকাতায় নির্মীয়মান ফরাসি চলচ্চিত্রকার জঁ রনোয়ার *দি রিভার* ছবির শুটিং পর্যবেক্ষণ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি *অমৃতবাজার* পত্রিকায় 'ন্যাশনাল স্টাইল ইন সিনেমা' নামে প্রবন্ধ লেখেন। এভাবেই সত্যজিৎ রায় ভবিষ্যতে মহৎ চলচ্চিত্র নির্মাণের শিক্ষা, বোধ, মনন, সৃজন কলায় নিজেকে তৈরি করেন।

সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের মহাকবি ও স্রষ্টা। তিনি একাধারে চলচ্চিত্রকার, প্রযোজক, কাহিনিকার, চিত্রনাট্যকার, সংলাপকার, সংগীতকার, গীতিকার, শিল্পকার, ক্যামেরাম্যান। চলচ্চিত্রের প্রতিটি শাখায় তাঁর ছিল সুনিপুণ দক্ষতা।

তাঁর পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের সংখ্যা ২৮, তথ্যচিত্র ৫, টিভিচিত্র ৩। অন্যের চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য ও সংগীত পরিচালনা ১৬।

তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে– *পথের পাঁচালী* (১৯৫৫), *অপরাজিত* (১৯৫৬), *পরশপাথর* (১৯৫৭), *জলসাঘর* (১৯৫৮), *অপুর সংসার* (১৯৫৯), *তিন কন্যা* (১৯৬১), *কাঞ্চনজঙ্ঘা* (১৯৬২), *অভিযান* (১৯৬২), *মহানগর* (১৯৬৩), *চারুলতা* (১৯৬৪), *কাপুরুষ ও মহাপুরুষ* (১৯৬৫), *নায়ক* (১৯৬৬), *চিড়িয়াখানা* (১৯৬৭), *গুপী গাইন বাঘা বাইন* (১৯৬৯), *অরণ্যের*

দিনরাত্রি (১৯৭০), *প্রতিদ্বন্দ্বী* (১৯৭০), *সীমাবদ্ধ* (১৯৭১), *অশনি সংকেত* (১৯৭৩), *সোনার কেল্লা* (১৯৭৪), *জন অরণ্য* (১৯৭৫), *শতরঞ্জ কি খিলাড়ি* (১৯৭৭), *জয় বাবা ফেলুনাথ* (১৯৭৮), *হীরক রাজার দেশে* (১৯৮০), *ঘরে বাইরে* (১৯৮৪), *গণশত্রু* (১৯৯০), *শাখা প্রশাখা* (১৯৮৯), *আগন্তুক* (১৯৯১) এবং *রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬১), *সিকিম* (১৯৭১), *বালা* (১৯৭৬), *পিকু* (১৯৮২), *সদগতি* (১৯৮২) প্রভৃতি।

তাঁর প্রতিটি চলচ্চিত্র বাস্তবতা, নির্মাণ কুশলতা, ভাব ব্যঞ্জনা, সম্পাদনা, শব্দ, সংগীত, প্রতিবেশ-পরিবেশ, সৃজনে, মননে উপস্থাপনায় ঋদ্ধ।

চলচ্চিত্রের জন্য তিনি পেয়েছেন দেশি-বিদেশি অসংখ্য পুরস্কার। এসবের মধ্যে রয়েছে– অস্কার, বার্লিন, ক্যান, ভেনিস, ম্যানিলা, নিউইয়র্ক, এডিনবার্গ, মস্কো, টরেন্টো, ডেনমার্ক, লন্ডন, মেলবোর্ন, তেহরান, ক্যালিফোর্নিয়া, হংকং উৎসবের পুরস্কার। এছাড়া অনেক বিশেষ সম্মান ও ব্যক্তিগত পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৩৬ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থা ও দেশ থেকে ।

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে সাহিত্য। তিনি বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি সাহিত্যের অনেক ধ্রুপদী উপন্যাস, গল্প ও নাটকের চলচ্চিত্ররূপ দিয়েছেন। এসবের মধ্যে রয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী*, *অপরাজিত*, *অপুর সংসার* ও *অশনি সংকেত*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *তিনকন্যা*, *(পোস্ট মাস্টার, সমাপ্তি মণিহার)*, *চারুলতা (নষ্টনীড়)* ও *ঘরে বাইরে*; পরশুরামের *পরশ পাথর*, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অভিযান* ও *জলসাঘর*, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের *দেবী*, নরেন্দ্র নাথ মিত্রের *মহানগর*, প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্রের *কাপুরুষ* ও পরশুরামের *মহাপুরুষ*, শরৎদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চিড়িয়াখানা*, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *অরণ্যের দিনরাত্রি* ও *প্রতিদ্বন্দ্বী*, শঙ্করের *সীমাবদ্ধ* ও *জন অরণ্য*, মুনসী প্রেমচন্দ্রের *শতরঞ্জ কি খিলাড়ি* ও *সদগতি* এবং হেনরি ইবসেনের *পাবলিক এনিমি* অবলম্বনে *গণশত্রু*।

এসব সাহিত্যকর্ম সত্যজিৎ রায়ের মননে সৃজনে চলচ্চিত্রায়িত হয়ে বিশ্বসংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছে। সাহিত্য ছিল অবলম্বন কিন্তু তাঁর কাছে তা হয়ে উঠেছে স্বাবলম্বন। তিনি সাহিত্যের ভাষা হুবহু অনুসরণ করেননি, তিনি চলচ্চিত্রের ভাষায় তা সৃজন করেছেন নান্দনিকরূপে।

চলচ্চিত্রের প্রয়োজনেই অনেক সাহিত্যের কাহিনি বর্ণনা শৈলী, চরিত্র, পরিবেশ, পরিস্থিতি, সূচনা ও অন্তিমপর্ব বদলে গেছে সত্যজিৎ রায়ের হাতে।

অনুপম হায়াৎ : চলচ্চিত্র গবেষক ও শিক্ষক

বাংলা কর্নার স্থাপন

মুজিববর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল নিউইয়র্কের উদ্যোগে এবং কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরির সহযোগিতায় কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে 'বাংলা কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশন উপলক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বাংলা কর্নার উদ্‌বোধন করেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি কম্যুনিটির সর্ববৃহৎ আবাসস্থল নিউইয়র্কস্থ কুইন্স বোরো যেখানে ইংরেজি, স্প্যানিশ ও চাইনিজ ভাষার পরেই বাংলা চতুর্থ বৃহৎ ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 'বাংলা কর্নার'টিতে সর্বমোট ৩০টি বই বাংলাদেশ কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে। বইগুলো বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিষয়ে বাংলাদেশের প্রথিতযশা লেখক ও সাহিত্যিকদের লেখা। এছাড়াও বাংলাদেশের উপন্যাস, গল্পসমগ্রসহ শিশু-কিশোর উপজীব্য বইসমূহ এ কর্নারে স্থান পেয়েছে।

উল্লেখ্য, এই বইসমূহ কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরির প্রধান শাখায় ৬ মাস প্রদর্শিত হবে এবং পরবর্তীতে উক্ত লাইব্রেরির বিভিন্ন শাখায় সংগৃহীত থাকবে।

২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত পরপর তিন বছর কুইন্সের মূলধারাকে সম্পৃক্ত করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কুইন্সে ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশি-আমেরিকানদের জন্য কনস্যুলেট যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে 'বাংলা কর্নার' স্থাপনের উদ্যোগ নেয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, ২০২১ সাল বিভিন্ন দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন। এছাড়াও বাংলাদেশ এ বছর স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবার সকল সূচকে সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে কারণে এ বছরের এ দিনে 'বাংলা কর্নার'-এর উদ্‌বোধন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের নিয়ে এই 'বাংলা কর্নার'-এ আসবেন এবং বই পড়বেন।

প্রতিবেদন: শুভ আহমেদ

মুজিব আদর্শ মুক্তিকামী মানুষের পাথেয়

মোতাহার হোসেন

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর থেকে প্রতিবছর ১৫ই আগস্টসহ পুরো মাস বাঙালির হৃদয়ে রক্তক্ষরণের মাস, শোকের মাস। পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্টের কালরাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যা করা হয়, যা যে-কোনো নারকীয় হত্যাকাণ্ডকে হার মানায়। কোনো বাঙালি জীবনের হুমকি হতে পারে, এটা কখনো ভাবেননি বঙ্গবন্ধু। এ কারণে সুরক্ষিত রাষ্ট্রপতির বাসভবন ছেড়ে বসবাস করতেন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে। কিন্তু রাতের আঁধারে ঐ বাড়িতে পৈশাচিক পন্থায় হামলা চালায় দিকভ্রান্ত কিছু সেনা কর্মকর্তা। বুলেটের আঘাতে ওরা কেড়ে নেয় একের পর এক প্রাণ।

ঘাতকের দল তাঁর সেই প্রিয় বাঙালিদের কাছ থেকে, স্বপ্নের স্বাধীন প্রিয় বাংলাদেশ থেকে বঙ্গবন্ধুকে চিরদিনের জন্য সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু শরীরী মুজিবকে হত্যা করলেও বাঙালির হৃদয় থেকে তাঁকে মুছে ফেলতে পারেনি তারা। নদীর স্রোতের মতো চির বহমান কাল থেকে কালান্তরে জ্বলবে এ শোকের আগুন। বঙ্গবন্ধু যেন মৃত্যুঞ্জয়ী এমন এক বীরের নাম।

সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালির ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্থপতিকে বিনম্র চিত্তে স্মরণ করি। এবারের পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন। যদিও বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে মুজিব জন্মশতবার্ষিকীর আয়োজন সীমিত পরিসরে করা হয়েছে। অনুরূপ ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচিও স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে করা হয়েছে। কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্মরিত হবেন কোটি কোটি বাঙালির হৃদয়ে। বাঙালি ও বাংলাদেশ, দেশের মানুষকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, স্বপ্ন, রাজনীতি, ধ্যান, জ্ঞান, তাঁর ত্যাগ মূল্যায়ন, পর্যালোচনা, অনুধাবন অপরিহার্য। বঙ্গবন্ধুর অন্তরজুড়ে ছিল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা, মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি। তিনি চেয়েছিলেন রাজনৈতিক মুক্তির পর বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি। বিশ্বের বুকে মর্যাদার সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়াবে বাংলাদেশ। কিন্তু দুর্ভাগ্য পঁচাত্তরের পর ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র থেকে গণতন্ত্র, মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সম্প্রীতির সুমহান আদর্শ মুছে ফেলার অপচেষ্টা চলেছিল। কিন্তু কালের পরিক্রমায় তা ব্যর্থ প্রমাণ হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া আওয়ামী লীগ তাঁরই আত্মজা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর ক্রমেই ফিরেছে মুক্তিযুদ্ধের ধারায়, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের ধারায়, অসাম্প্রদায়িক চেতনায়। একদিকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া অনেকাংশে সম্পন্ন হয়েছে, অন্যদিকে জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দৃশ্যমান অর্জন সম্ভব হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু নিজের পায়ে দাঁড়ানোর যে প্রত্যয় বারংবার ব্যক্ত করতেন; নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ, আকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ তারই সার্থক রূপায়ণ। স্বয়ং বঙ্গবন্ধুও ক্রমে আমাদের প্রাত্যহিক জাতীয় ও সামাজিক জীবনে ফিরে এসেছেন স্বমহিমায়, সগৌরবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সংহতির প্রতীক বঙ্গবন্ধু এখনও তাঁর জীবন, কর্ম ও বাণী, তাঁর আদর্শিক আলো দিয়ে জাতিকে আলোকিত করছেন, পথ দেখাচ্ছেন, শক্তি জুগিয়ে চলেছেন, অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন। অনাগত দিনেও বঙ্গবন্ধু হয়ে থাকবেন বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য প্রেরণার অনিঃশেষ বাতিঘর। আমাদের কর্মের প্রেরণায় বঙ্গবন্ধু, হৃদয়ে বাংলাদেশ।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখতে পাব, আজ থেকে এক শতাব্দী আগে বাংলার নিভৃত পল্লিতে জন্মগ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু যেভাবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে দিয়েছিলেন, তা বিশ্বেরও বিস্ময়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আজীবনের স্বপ্ন ছিল বাংলার স্বাধীনতা ও বাঙালির জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠা। শৈশব-কৈশোর থেকে তিনি এই আদর্শ নিয়েই বড়ো হয়ে ওঠেন। নিজেই নিজেকে প্রস্তুত করে তোলেন। তাঁর এই চারিত্রিক দৃঢ়তার পেছনে ছিল গভীর অধ্যয়ন, দেশাত্মবোধ, মানুষের প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা, জানা-চেনা-শোনা ও দেখার গভীর অন্তর্দৃষ্টি। তিনি হৃদয়ের আবেগকে যথেষ্টভাবে ধারণ করতে সমর্থ হন। এর পেছনে ছিল মানুষকে ভালোবাসা ও সাহায্য করার জন্য তাঁর দরদি মন। বঙ্গবন্ধু সবসময় বলতেন, 'সাত কোটি বাঙালির ভালোবাসার কাঙাল আমি। আমি সব হারাতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারব না।'

বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কেবল আনুষ্ঠানিকতায় সীমিত না রেখে তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে মুক্তি ও মানবতার পক্ষে কাজ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সবাই যদি বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে দেশ গড়ায় আত্মনিয়োগ করি, সেটাই হবে তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। করোনা পরিস্থিতিতে এই উপলব্ধি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক।

বঙ্গবন্ধু তাঁর সৃজন সম্ভারে, তাঁর আদর্শেও তাঁর দলের নেতাকর্মীদের, তাঁর অনুসারীদের কাছে, আপামর মানুষের কাছে তিনি সজীব। দুঃখ-শোক, আনন্দ-বেদনায় সকল মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু আজ অবধি প্রাসঙ্গিক এবং অপরিহার্য। যদিও কোনো মানুষের মৃত্যু চিরস্থায়ী বেদনা এবং প্রস্থান হলেও কীর্তিমান মানুষরা আপন বৈভবের সম্ভারে কখনও বিস্মৃতির অতলে, অন্ধগহ্বরে হারিয়ে যান না। এমন সব ক্ষণজন্মা মহামানব যুগের ও কালের প্রতিনিধি হয়ে সর্বকালের জন্য আলোকরশ্মি, চেতনার অগ্নি মশাল পৌঁছে দিতেও নিরন্তর কাজ করে যান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক।

মোতাহার হোসেন: প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম

জনগণের পাশে শেখ হাসিনা

আবু সালেহ মোহাম্মদ মুসা

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে করোনার ক্রান্তিকালেও। শক্ত হাতে, বলিষ্ঠ নেতৃত্বে, স্নেহময়ীরূপে, মানবসেবায় হাত বাড়িয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মানুষের পাশে দাঁড়াতে তিনি এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন।

বাংলাদেশের মানুষের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছেন প্রধানমন্ত্রী এক পরিকল্পিত হাতে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাস্তবায়ন করেছেন মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, ১০ টাকা কেজি চাল, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, শিশু কার্ড (৩০ কেজি চাল), কৃষি উপকরণ, ঈদ উপহার (১০ কেজি চাল), মৎস্য খাতে আর্থিক সহায়তা, কৃষিক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা, গরুর খামারিদের প্রণোদনা, ভূমিহীনদের আশ্রয়ণ প্রকল্পে জমিসহ বাড়ি, উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষা উপকরণ, প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পোশাক পরিচ্ছদ ও উপবৃত্তির টাকা, দুপুরে টিফিন ইত্যাদি কর্মসূচি। এছাড়াও ফ্রি বই-পুস্তক প্রদান মাধ্যমিক পর্যন্ত সরকার দিচ্ছে। এছাড়া পশু ও হাঁস-মুরগি পালনে আর্থিক সহায়তা প্রদান, কৃষি খাতে বৈদ্যুতিক সুবিধা প্রদান করছে। শীতকালে বয়স্কদের মধ্যে কম্বল বিতরণ, বিদ্যুৎ লাইনের সহজলভ্যতা এবং বিদ্যুৎ লাইন দেওয়া সম্ভব না হলে সৌর বিদ্যুৎ প্রদান, খাবার পানির সংকট নিরসনে পাইপসহ টিউবওয়েল প্রদান, বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য ট্যাংক প্রদান, আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে এক লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় ঘর তৈরি করে দিচ্ছে। সরকারের দেওয়া অনুদানের টাকা যাতে প্রকৃত প্রাপকের হাতে সরাসরি পায় সেজন্য মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে।

বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে জীবন রক্ষার্থে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হচ্ছে। এর ফলে নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। করোনাভাইরাসজনিত কারণে কর্মহীনতা ও আয়ের সুযোগ হ্রাসের কবল থেকে দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সূত্র মতে, বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৩৫ লাখ পরিবারকে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়।

এ বছর করোনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৬ লাখ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে করোনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে মাথাপিছু ২৫০০ এবং ৫০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। গত বছর থেকে 'নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান' কর্মসূচি চালু করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ বছরও করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোকে সরাসরি নগদ অর্থ প্রেরণ শুরু হয়েছে। ইএফটির'র মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টে বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই অর্থ সহায়তা পাচ্ছে।

গত বছর অর্থাৎ ২০২০ সালে করোনা মহামারির কারণে যে সকল নিম্ন আয়ের পরিবার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং কর্মহীন হয়ে পড়েছিল তাদেরকে সহায়তার জন্য 'নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান' কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল। ২০২০ সালে করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৫ লাখ নিম্ন আয়ের পরিবারকে পরিবারপ্রতি ২,৫০০ টাকা করে ৮৮০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় চলমান করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৫ লাখ নিম্ন আয়ের পরিবারকে এ বছরও পরিবারপ্রতি ২,৫০০ টাকা করে মোট ৮৮০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, এ বছর সংঘটিত ঝড়ো হাওয়া, শিলাবৃষ্টি ও ঘূর্ণিঝড়ে দেশের ৩৬টি জেলার ৩০ লাখ ৯৪ হাজার ২৪৯ হেক্টর ফসলি জমির মধ্যে ১০ হাজার ৩০১ হেক্টর ফসলি জমি সম্পূর্ণ এবং ৫৯ হাজার ৩২৬ হেক্টর ফসলি জমি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মর্মে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে তথ্য পাওয়া যায় এবং এতে করে ১ লাখ কৃষক সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। কোভিড-১৯-এর ফলে কর্মহীন এবং ক্ষতিগ্রস্ত এসব কৃষকদের জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনার সুপারিশ করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়। এ বাবদ ৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক এসব ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা (নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও মোবাইল নম্বর) প্রণয়নের কাজ করছে।

এবারে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অর্থ বিভাগের বাজেটের অধীন 'করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় তহবিল'-এ বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে নির্বাহ করা হয়। কোভিড-১৯ বিস্তার রোধকল্পে সার্বিক বিধিনিষেধ আরোপ করার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দিনমজুর, কৃষক, শ্রমিক, গৃহকর্মী, মটর শ্রমিকসহ অন্যান্য পেশায় নিয়োজিতদের পুনরায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টিও বিবেচনা করা হয়েছে। সরকারের এ কর্মসূচি বিশেষভাবে করোনাকালীন পরিস্থিতিতে অব্যাহত থাকবে, সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে এটাই সকলের প্রত্যাশা।

বিশ্বের সকল দেশের কাছে এখন প্রধান সমস্যা করোনা। আমাদের দেশও কঠিন সময় অতিবাহিত করছে। ঠিক এমনই এক সময়ে, দেশের হাল আরও শক্তভাবে হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমরা সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলব, এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করব– এই হোক আজকের অঙ্গীকার।

আবু সালেহ মোহাম্মদ মুসা : ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক ও কলামিস্ট, asm.19musa@gmail.com

জাতীয় বাজেটে শিশু বাজেট ও শিশু উন্নয়ন

এম. হোমায়েদ নাসের

শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। শিশুরাই জাতিকে নেতৃত্ব দিবে। তাই ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সুশিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের গড়ে তোলাটা জরুরি, যাতে করে শিশুরা ভবিষ্যতে বিশ্বে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। শিশুদের সুন্দর জীবনের জন্য তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দেশের পাশাপাশি বিশ্বকে বাসযোগ্য করতে শিশুদের মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটানো অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, মাদক ও দুর্নীতির বিরূপ প্রভাব থেকে মুক্ত করে আমাদের শিশুদের একটি সুন্দর ও উন্নত জীবন নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৪৫ শতাংশ শিশু। এদের উন্নয়নে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে পাঁচটি মন্ত্রণালয়কে সঙ্গে নিয়ে শিশুদের জন্য আলাদা শিশু বাজেট প্রণয়ন করে। এটি নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে শুরু হওয়া শিশু বাজেট ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এসে দ্বিগুণ হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য চার হাজার ১৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়, যা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ছিল তিন হাজার ৮৬০ কোটি টাকা। নারী ও শিশুদের সংকট ও ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা ও স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিতকরণে সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গর্ভস্থ সন্তানের পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে মাতৃত্বকালীন ভাতা ও কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

সরকার স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। শিশুদের পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিশুদের খেলার সুযোগ করে দিতে প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হচ্ছে। শিশুরা বিদেশের মাটিতে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে অনেক আন্তর্জাতিক পুরস্কার নিয়ে এসেছে। 'জাতীয় শিশুনীতি ২০১১' প্রণয়নের মাধ্যমে শিশুদের সার্বিক অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে। দেশের ৪০টি জেলার সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থাপন করা হয়েছে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল। দুস্থ, এতিম, অসহায় পথশিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য স্থাপন করা হয়েছে ১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের নারী ও শিশুর উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের 'সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড' পান।

শিশুর বিকাশ যদি বাধাগ্রস্ত হয়, তারা যদি তাদের পূর্ণ অধিকার নিয়ে যোগ্য নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠতে না পারে, তাহলে আগামী দিনের নেতৃত্ব দিতে পারবে কি না তা নিয়ে আশঙ্কা থেকেই যায়। শিশুর অধিকার একজন সাধারণ মানুষের সমান। মানুষের মৌলিক অধিকার– অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা। এই ৫টি যদি আমরা পুরোপুরিভাবে শিশুদের জন্য নিশ্চিত করতে পারি তাহলে তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা হয়তবা খুব কঠিন হবে না। তাদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে প্রয়োজন উন্নত এবং অনুকূল পরিবেশ।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য স্থির করেছে। সেই উন্নত রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিতে হবে নতুন প্রজন্মকেই। তাই একটি শিশুকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই শিশুর পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুসারে ১৮ বছরের নিচে সকলেই শিশু হিসেবে স্বীকৃত।

শিশু অধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত আন্তরিক। সরকার শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় নির্বাচনি ইশতাহারে বেশ কিছু অঙ্গীকার করেছে এবং সেসব বাস্তবায়নে নানাবিধ কার্যক্রমও গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নীতির মৌল আদর্শ বর্ণনায় শিশুর অধিকারের প্রাসঙ্গিক বিধান এবং মৌলিক অধিকারসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে। সংবিধানের ২৭, ২৮ ও ৩১ অনুচ্ছেদে সব ধরনের বৈষম্য থেকে শিশুর নিরাপত্তা বিধানের সাধারণ নীতিমালার উল্লেখ রয়েছে। এসব অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান ও অভিন্ন নিরাপত্তা লাভের অধিকারী বিধায় পক্ষপাতহীনভাবে তাদের আইনের সুযোগ লাভের অধিকারও রয়েছে।

সরকারিভাবে শিশুদের মানসিক বিকাশে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান, যেমন– শিশু একাডেমি, খেলাঘর, শাপলা-শালুক, কচিকাঁচার আসর ইত্যাদি। তাছাড়া প্রচার মাধ্যমগুলোও শিশুদের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে, যেমন– মিনা কার্টুন, সিসিমপুর ইত্যাদি। এসব অনুষ্ঠান যেমন বিনোদনধর্মী তেমনি শিক্ষামূলকও বটে। এছাড়া বেশকিছু বেসরকারি সংস্থাও গড়ে উঠেছে ঝরে পড়া কর্মজীবী শিশুদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য অধিকার প্রদানের জন্য।

শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময়ে প্রণীত হয়েছে

শিশু আইন ১৯৭৪। বঙ্গবন্ধুর পথ অনুসরণ করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধাসমূহ দূর করে একটি সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণে ঘোষণা করেছে ভিশন ২০২১। এই লক্ষ্য সামনে রেখে সব শিশুকে আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রণয়ন করেছে জাতীয় শিশু সুরক্ষা নীতিমালা ২০১০। এটি শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সুদূরপ্রসারী রূপকল্প। এছাড়াও শিশু অধিকার রক্ষায় বর্তমান সরকার প্রণয়ন করেছে পারিবারিক সহিংসতা আইন ২০১০, জাতীয় শিশুশ্রম নীতিমালা ২০১০, বাংলাদেশ জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এবং শিশু অধিকার আইন ২০১৩।

শিশু অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের অর্জন ঈর্ষণীয়। এক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজির অর্জন অগ্রগণ্য। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য কেবল দক্ষিণ এশিয়াতেই নয়, সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। বলা হয় বাংলাদেশ এমডিজি অর্জনের রোল মডেল। এমডিজির অনেকগুলো লক্ষ্য ছিল শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এমডিজি-২ অর্থাৎ সমতার ভিত্তিতে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। এমডিজি-৪ এ ছিল শিশুমৃত্যু হার হ্রাসকরণ। বাংলাদেশ ৭২ শতাংশ শিশুমৃত্যুর হার রোধে সক্ষম হয়েছে। এজন্য ২০১২ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের এমডিজি-৪ পুরস্কার অর্জন করে। সারা দেশে ১৩ হাজার ৮৬১টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাতৃমৃত্যু হার ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে কাজ করছে সরকার। এমডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে অকল্পনীয় সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতিসরূপ ২০১৫ সালে জাতিসংঘের সম্মানজনক পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ'-এ ভূষিত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)'র মেয়াদ শেষে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের উদ্যোগে সকল মানুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে একটি অধিকতর টেকসই ও সুন্দর বিশ্ব গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সর্বজনীনভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর থেকে বার্ষিক বাজেটে এসডিজিকে সম্পৃক্ত করেছে। সেখানে শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এসডিজি-২ এর আলোকে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সি শিশুর বিকাশের বাধাসমূহ ৩৬.১ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য স্থির করেছে সরকার। এসডিজি-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ)-এর আলোকে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সি শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪১ থেকে ৩৪-এ নামিয়ে আনা হবে। এসডিজি-৪ (মানসম্পন্ন শিক্ষা)-এর আলোকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার ১০০ শতাংশ নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর হার বর্তমানে ৮০ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার।

শিশু অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামনে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে শিশুশ্রম নিরসন। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, ১৭ লক্ষ শিশু শ্রমে নিয়োজিত যাদের মধ্যে প্রায় ১৩ লক্ষ শিশু অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। বর্তমান সরকার শিশুশ্রম নিরসনে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গার্মেন্টস শিল্পে শিশুশ্রম শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে এদেশ থেকে সকল প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের শিশুশ্রম বন্ধে বদ্ধপরিকর। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সুরক্ষিত শিশু অধিকার সম্পন্ন বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা সবাই সচেষ্ট থাকব মুজিববর্ষে– এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

এম. হোমায়েদ নাসের: মাস্টার্স শিক্ষার্থী, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আইইউটি), গাজীপুর, naser154439@gmail.com

ডাক ব্যবস্থাকে ডিজিটালে রূপান্তর

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, ডাকঘরের দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক ও অবকাঠামো আমাদের বিশাল সম্পদ। এই সম্পদকে জাতির কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে। ডিজিটাইজেশনের প্রভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চিঠি আদান-প্রদানের যুগ শেষ হয়ে গেলেও পণ্য পরিবহণে ডাক বিভাগকে শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি পুরো ডাক ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করছি আমরা। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ৯ই অক্টোবর ঢাকায় ডাক ভবন মিলনায়তনে বিশ্ব ডাক দিবস উপলক্ষে ডাক অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনাসভা ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পত্রলিখন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. সিরাজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত থেকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মো. আফজাল হোসেন এবং অনুষ্ঠানে বিটিআরসি চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার বক্তৃতা করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বিশ্ব ডাক দিবসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ডিজিটাল যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ডাকঘরকে পণ্য পরিবহণ ও বিতরণের ব্যাকবোন হিসেবে প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। তিনি বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির কল্যাণে চিঠির যুগ শেষ হয়ে গেলেও ডাক সেবার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি বরং উত্তরোত্তর এর প্রয়োজনীয়তা বেড়েই চলেছে। তিনি বলেন, ডাকঘরকে ডিজিটাইজেশনের জন্য ডিজিটাল সার্ভিস ল্যাব করেছি। সেখান থেকে ডিজিটাল প্রক্রিয়া কীভাবে করা যায়– সে লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ডিজিটাল ডাকঘরের উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে ২০০টি ডিজিটাল সরকারি সেবা প্রদান করা হচ্ছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, জনবলকে দক্ষ করে তৈরি করা থেকে শুরু করে অবকাঠামো পর্যন্ত ডিজিটাল বাংলাদেশের পথ ধরেই এগুবে ডাক বিভাগ। ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ইউনিভার্সেল পোস্টাল ইউনিয়ন (ইউপিইউ) এবং আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর সদস্য পদ অর্জনের ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের বিভিন্ন গৌরবোজ্জ্বল অর্জনের কথা তুলে ধরেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে ডাক বিভাগ ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিবেদন: পি আর শ্রেয়সী শ্যামা

বাংলাদেশ পোলিও টিকায় রোল মডেল

সুস্মিতা চৌধুরী

পোলিওমাইলিটিজ (Poliomyelitis) এক ধরনের ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। সচরাচর এটি পোলিও নামে পরিচিত। এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি এ ধরনের ভাইরাসের মাধ্যমে আক্রান্ত হন। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সাময়িক কিংবা স্থায়ীভাবে শারীরিক ক্ষতির সম্মুখীন হন ও তার অঙ্গ অবশ হয়ে পড়ে। সাধারণত এ সংক্রমণ শিশুসহ কিশোরদের বেশি হয়ে থাকে। শতকরা ৯৫ ভাগেরও অধিক পোলিও আক্রান্ত রোগীর শরীরে কোনো উল্লেখযোগ্য দৃশ্যমান উপসর্গ কিংবা স্বল্পমাত্রার উপসর্গ দেখা যায় না। কেবলমাত্র রক্তে প্রবাহিত হয়ে আক্রান্ত হবার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে তা দৃশ্যমান হয়। এ ভাইরাসটি মানবদেহের স্নায়ুতন্ত্রে প্রবেশ করে ও মাংসপেশি নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ুকোষকে আক্রান্ত করে। এর ফলে ব্যক্তির শরীর পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত স্থানটি সাধারণত পায়ে হয়ে থাকে। এছাড়াও এর ধ্বংসাত্মক প্রবণতা মানুষের মস্তিষ্কে ঘটে যা জটিল থেকে জটিলতর হয়। কখনো কখনো এটি মৃত্যুর কারণও হয়ে দাঁড়ায়। পোলিও রোগ ৫ বছরের শিশুদের জন্য বেশি ক্ষতিকর।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ 'ভ্যাকসিন হিরো' পুরস্কারে ভূষিত হন– পিআইডি

সাধারণত পোলিও ভাইরাস শরীরে প্রবেশের ৭ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে পোলিও রোগের লক্ষণ প্রকাশ প্রায়। এই রোগের লক্ষণগুলো হলো– শিশুদের সর্দি-কাশির সঙ্গে জ্বর, মাথা ব্যথা, সারা শরীরে ব্যথা, গলা ব্যথা, বমিবমি ভাব, ঘাড় ও পিঠ শক্ত এবং হাত ও পা অবশ হয়ে যায়, মুখের একপাশ অবশ হয়ে যেতে পারে, মস্তিষ্কের সমস্যা দেখা দিলে ঢোক গিলতে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং হাত ও পা চিকন হয়ে যায়।

পোলিও ভাইরাস থেকে বাঁচতে সারা বিশ্বে দুই প্রকার পোলিও টিকা ব্যবহার করা হয়, যেগুলো মূলত poliomyelitis (পোলিও) নামক রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। এই দুই প্রকার টিকার মধ্যে একটিতে অক্রিয় পোলিও ভাইরাস এবং অপরটিতে দুর্বলকৃত পোলিও ভাইরাস ব্যবহার করা হয়। এই দুই প্রকার টিকা যথাক্রমে ১৯৫৫ এবং ১৯৬২ সাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে। এ টিকা দেওয়ার ফলে পোলিও ভাইরাস ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ছড়াতে পারে না। ফলে পোলিও রোগ নির্মূলে সারা বিশ্বে এ টিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয় উঠে। কারণ পোলিও ভাইরাস রোগীদের মাঝে দীর্ঘদিন অবস্থান করতে পারে না, তদুপরি প্রকৃতিতে স্তন্যপায়ীরা ছাড়া অন্য কোনো পোলিও বাহকও নেই, তাছাড়া এ ভাইরাসটি প্রকৃতিতে খুব লম্বা সময়ের জন্য বাঁচতেও পারে না। ফলে এই দুই প্রকার টিকা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ থেকে পোলিওকে নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছে।

জোনাস এডওয়ার্ড সল্ক প্রথম পোলিও টিকার উদ্ভাবন করেন। ওই টিকাতে তিনি অক্রিয় পোলিও ভাইরাস ব্যবহার করেন। তিনি এই টিকায় বৈজ্ঞানিক কাজে ব্যবহৃত এক ধরনের বিশেষ কোষ (HeLa কোষ) ব্যবহার করেন, এবং ১৯৫২ সালে সর্বপ্রথম এর পরীক্ষা চালান। ডা. টমাস ফ্রান্সিস জুনিয়র ১৯৫৫ সালের ১২ই এপ্রিল গোটা বিশ্বে এই টিকার কথা ঘোষণা করেন। আলবার্ট সাবিন দুর্বলকৃত পোলিও ভাইরাস ব্যবহার করে দ্বিতীয় প্রকার টিকা উদ্ভাবন করেন, যা কি না মুখ দিয়ে খাওয়া যায় (অর্থাৎ ওরাল)। ১৯৫৭ সাল থেকে সাবিনের এ টিকা দেওয়া শুরু হয়, এবং ১৯৬২ সালে-এর লাইসেন্স করা হয়।

পোলিওভাইরাসে আক্রান্ত রোগটি প্রতিকারযোগ্য নয়, এটি প্রতিরোধযোগ্য। পোলিও রোগের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত ডাক্তারের কাছে যেতে এবং সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম নিতে হবে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ১. জন্মের পর থেকে প্রত্যেক শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়াতে হবে। ২. গোসল করা, কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি কাজে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে হবে। ৩. স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার করতে হবে। ৪. টয়লেট ব্যবহারের পর ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করতে হবে। ৫. খাওয়ার আগে ও পরে হাত, মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। ৬. নোংরা, অপরিষ্কার কাপড় পুকুরে ধোয়া যাবে না।

বাংলাদেশে ১৯৭০ এবং ১৯৮০'র দশকে পোলিও রোগীর সংখ্যা ছিল অনেক। সেই প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সাল থেকে জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি চালু হয়। নব্বইয়ের দশকে পোলিও নির্মূলে সফলতা আসতে থাকে। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে প্রতি এক লাখের মধ্যে পাঁচ বছরের নিচের বয়সের শিশুদের মধ্যে পোলিও রোগীর সংখ্যা ছিল ৫২ জন। ১৯৮৬ সালের আগে বাংলাদেশে প্রতিবছর কমপক্ষে সাড়ে এগারো হাজার শিশু পোলিও রোগে আক্রান্ত হতো। তবে ১৯৮৮ সালে বৈশ্বিক পোলিও নির্মূল কর্মসূচির আওতায় দেশে টিকাদান কর্মসূচি শুরু হলে তা দ্রুত কমতে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে ২০০৬ সালে এসে বাংলাদেশ সম্পূর্ণরূপে পোলিও মুক্ত হয়।

পোলিও মুক্ত বহুদেশের মতো বাংলাদেশও ১৯৯৫ সাল থেকে শিশুকে মুখে খাওয়ানোর পোলিও টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে পোলিও নির্মূলকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিবছর ১ লক্ষ শিশুকে দুই ফোটা মুখে খাওয়ানো টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় টিকা দিবস পালিত হয়ে থাকে। স্বাস্থ্যসেবায় সরকারের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই কর্মসূচির সাফল্যের পাল্লাটা বেশ ভারী, যার জন্য মিলেছে নানান স্বীকৃতি। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ কর্মসূচি বাংলাদেশকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছে। সব থেকে বড়ো কথা হলো– এ কর্মসূচির ফলেই দেশে শিশুমৃত্যুর হার কমানোর পাশাপাশি পঙ্গুত্ব রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। তৃণমূলের স্বাস্থ্যকর্মী-মাঠকর্মীদের আন্তরিকতা আর কমিউনিটির জনগণ, বিশেষ করে মায়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণই সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে সাফল্য আনা সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে ২১টি জাতীয় টিকা দিবস পালন করে বাংলাদেশ পোলিও মুক্ত হয়েছে। ২০০৬ সালের ২২শে নভেম্বর সর্বশেষ পোলিও রোগী শনাক্ত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত দেশে আর কোনো পোলিও রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। টিকাদান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সফলতার জন্য ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ভ্যাকসিন হিরো' পুরস্কার দিয়েছে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন এবং ইমিউনাইজেশন (জিএভিআই)।

সুস্মিতা চৌধুরী: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই অক্টোবর ২০২১ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দুর্গাপূজা উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

শারদীয় দুর্গাপূজা

প্রশান্ত কুমার দে

বাঙালি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব। শরৎকালে এই উৎসব হয় বলে এ উৎসবকে শারদোৎসব বলা হয়। 'দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন' অর্থাৎ সব অশুভ শক্তির নির্মূল করার জন্যই পৃথিবীতে প্রতিবছর দেবী দুর্গা আবির্ভূত হন। সাধারণত শরৎকালের আশ্বিন-কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে অনুষ্ঠিত হয় শারদীয় দুর্গাপূজা।

দুর্গা শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ দুর্গতিনাশিনী। দেবী দুর্গার বাহন সিংহ। সিংহবাহিনী দেবী দুর্গা সাধারণত গজ, ঘোটক, নৌকা এবং দোলা এই চার প্রকার বাহনেই আগমন এবং গমন করেন। দেবীর আগমন বা গমন যোগের উপর প্রকৃতির পরিবর্তন নির্ভর করে। দুর্গাপূজা মূলত দশ দিনের উৎসব। শুরু হয় দেবীপক্ষের 'মহালয়া' পর্ব দিয়ে। মহালয়াতে দেবী দুর্গাকে পিত্রালয়ে আবাহন জানানো হয়। মহালয়ার পরে আসে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এবং দশমী। এ বছর দেবীপক্ষের সূচনা হয় ৬ই অক্টোবর ২০২১ (২১শে আশ্বিন ১৪২৮) মহালয়া পর্ব দিয়ে। ১১ই অক্টোবর (২৬শে আশ্বিন) মহাষষ্ঠীতে দেবী দুর্গার বোধন দিয়ে দুর্গাপূজার মূল পর্ব শুরু হয় এবং ১৫ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) বিজয়া দশমীর দিনে সমাপ্তি হয়।

দুর্গাপূজা নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। দুর্গাপূজার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। হিন্দু পুরাণে দুর্গাপূজার সূচনা সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনি পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে কোথাও কোথাও কথিত আছে, পুরাকালে রাজা সুরথ তাঁর হারিয়ে যাওয়া রাজ্য ফিরে পাওয়ার জন্য এক মুনির পরামর্শে দেবী দুর্গার পূজা করেন। পূজায় দেবী তুষ্ঠ হয়ে দেবীর দেওয়া বরে রাজা সুরথ তাঁর রাজ্য ফিরে পায়। তখন এই পূজা হয়েছিল বসন্তকালে। সেজন্য এই পূজাকে 'বাসন্তী পূজা' বলা হতো।

শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, ব্রহ্মা মহিষাসুরের ভক্তি ও তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর দিতে চান। মহিষাসুর 'অমর' বর প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা সরাসরি অমরত্ব বর না দিয়ে বর দিলেন- বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো পুরুষের হাতে মহিষাসুরের মৃত্যু হবে না। এমন বর পেয়ে মহিষাসুর স্বর্গলোক ও মর্ত্যলোকে হয়ে ওঠে অত্যাচারী, হয়ে যান অসুরকুলের রাজা। একসময় মহিষাসুর স্বর্গরাজ্য দখল করলে দেবতারা স্বর্গরাজ্যহারা হন। এজন্য দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। যেহেতু ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষ দ্বারা অবধ্য ছিল, তাই বিষ্ণুর নির্দেশে সকল দেবতার তেজঃপুঞ্জ থেকে এক শক্তিশালী নারীর বন্দনা করা হয়। আবির্ভূত হন দশভূজা নারী রূপী এক দেবী। তিনিই মা দুর্গা। এরপর দেবতাদের শক্তিতে শক্তিময়ী এবং অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দেবী দুর্গা মহাযুদ্ধে মহিষাসুরকে বধ করেন। তাই দেবীকে বলা হয় মহিষমর্দিনী। দেবতারা ফিরে পান তাদের স্বর্গরাজ্য।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসারে, শ্রী রামচন্দ্র শরৎকালে সীতা উদ্ধারের নিমিত্ত লঙ্কাধিপতি রাবণের সাথে যুদ্ধের পূর্বে ১০৮টি নীল পদ্ম সহযোগে ব্রহ্মার পরামর্শে দেবী দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। শরৎকাল দেবতাদের নিদ্রাকালীন সময় হিসেবে শাস্ত্রে বিবেচিত হওয়ার কারণে শ্রী রামচন্দ্রের আয়োজিত এই পূজাকে অকালবোধন বা শারদীয় দুর্গাপূজা বলা হয়ে থাকে। তাছাড়া শরৎকালের এই দুর্গাপূজা সম্পর্কে হিন্দুদের বিভিন্ন শাস্ত্র যেমন: দেবীভাগবত পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, দেবীমাহাত্ম্যম্ ইত্যাদি স্থানে উল্লেখ আছে। বাঙালিরা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বর্ণিত শ্রী রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবকেই বেছে নিয়েছে।

শারদীয় দুর্গাপূজা মানেই কন্যারূপে দেবীর আগমন সপরিবারে। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী সবাই দেবীর পরিবারভুক্ত। দুর্গাপূজা সম্পন্ন হয় কিছু নির্দিষ্ট পৌরাণিক রীতিনীতির মধ্যে দিয়ে। ষষ্ঠী পূজার দিন দুর্গাপূজার এক মহাপর্ব। সন্ধ্যায় বিল্ববৃক্ষে বোধন আমন্ত্রণ অধিবাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং ঐ সময়ে দেবীর মৃন্ময় প্রতিমায় অধিবাস করা হয়। পরদিন মহাসপ্তমী ভোরবেলায় বিল্ববৃক্ষ মূলে পূজাদি পর্ব করে নবপত্রিকা স্নান করানো হয়। নবপত্রিকাকে চলিত ভাষায় কলাবৌ বলে। মূলত এতে কলা, কচু, মান, ধান, বেল, অশোক, জয়ন্তী, ডালিম ও হলুদ– এই নবপত্রিকা বা গাছ একত্রে থাকে। নবপত্রিকা স্নান করিয়ে গণেশের পাশে স্থাপন করে যথাবিধি অনুযায়ী মহাসপ্তমী পূজা শেষ হয়। মহাষ্টমী পূজার দিনে 'কুমারী পূজা' ও 'সন্ধি পূজা' করা হয়। দেবী পুরাণে ১ বছর থেকে ১৬ বছরের অজাতপুষ্প সুলক্ষণা কুমারীকে পূজার উল্লেখ রয়েছে। মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় ১০৮টি প্রদীপ জ্বালিয়ে ও ১০৮টি নীল পদ্মফুল দিয়ে সন্ধি পূজা করা হয় (সন্ধি: অষ্টমী তিথির শেষ এবং নবমী তিথির শুরু)। সন্ধি পূজার সমাপ্তি পর্ব থেকেই মহানবমী শুরু হয়, দেবীকে 'অন্নভোগ' সাজিয়ে দেওয়া হয়। দেবী দুর্গার বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বিজয়া দশমী। আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে এই উৎসব সমাপ্ত হয়। এদিনে বাঙালি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার প্রতিফলন ঘটে যেমন- শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ধান-দূর্বা সমর্পণ, একে অপরের মিষ্টিমুখ করানো, দেবীর সিঁথিতে সিঁদুর পরানো এবং সর্বশেষ উলুধ্বনির মাধ্যমে মা দুর্গার কাছে বিশ্বের সকলের মঙ্গল কামনা করা হয়।

প্রশান্ত কুমার দে: প্রাবন্ধিক

রাসেলের নিঃসঙ্গ দিন

রফিকুর রশীদ

রাসেলের ভীষণ জ্বর।

গা-হাত-পা পুড়ে যাচ্ছে। চোখের পাতা ভারী। চোখের ভেতরে জ্বালা করছে। একটুখানি কাঁদতে পারলে বেশ হতো। কিন্তু কান্না আসছে না যে! যন্ত্রণায় কপালের দুপাশের রগ দাপাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন শিরা-উপশিরা যে-কোনো সময় ছিঁড়ে যাবে। কী সাংঘাতিক অবস্থা!

এমন আকাশপাতাল যার জ্বর, তার কি মাথা ঠিক থাকে! জ্বরের ঘোরে কত কী যে মনের ভেতরে ঘুরপাক খায়, তা কি মুখে প্রকাশ করা যায়! মুখের উপরে নিয়ন্ত্রণ নেই, কত আজেবাজে কথা হুড়মুড় করে ঠেলে বেরোতে চাইছে, বেরিয়ে যাচ্ছেও। সে সব কথা কেউ শুনলে নির্ঘাত বলবে- জ্বরের ঘোরে ছেলেটা ভুল বকছে। কেউ বা এক আঁজলা সহানুভূতিও দেখাতেও পারে– আহা, এমন দুঃসময়ে ওর পাশে কেউ নেই! একেবারে একা একা কাতরাচ্ছে! সত্যিই কেউ নেই মাথার পাশে!

এতক্ষণে চোখের কোণা ভিজে আসে রাসেলের। ভাবনার সবগুলো সুতো একত্রিত করেও সে উত্তর খুঁজে পায় না– কখন, কীভাবে সে এ রকম একা হয়ে গেল! তার কি আপনজন বলতে কেউ ছিল না কোনো কালে! মা-বাবা, ভাইবোন, ছোটো-বড়ো প্রাণের স্বজন তার কেউ ছিল না? মাও ছিল না? মায়ের কথা মনে পড়তেই চোখ ফেটে কান্না আসে। 'মাগো' বলে একবার অস্ফুটে ফুঁপিয়ে ওঠে।

কী আশ্চর্য ! চরম এই দুঃসময়ে হাসুবুও নেই তার মাথার পাশে। সবার বড়ো বোন হাসুবু, বাড়ির সবার বিপদ-আপদের খবর সে সবার আগে টের পায়। নিজের ভালোমন্দ বিবেচনা না করে সবার পাশে সে ছুটে যায়। রাসেল সবার ছোটো ভাই। অতি আদরের রাসেল। সেই রাসেলের এমন কষ্টের সময়ে সে দূরে থাকতে পারে! তাই কখনো হয়! সে জানে, হাসুবুর অনেক কাজ। সারা দেশ নিয়ে তাঁর ভাবনা। দেশের মানুষ তাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর ছবি দেখতে পায় হাসুবুর মুখের আদলে। তাদের রাশি রাশি প্রত্যাশা মুজিবকন্যার কাছে। মানুষের হাজারও স্বপ্ন ঘিরে আছে তার চারপাশে। তাই বলে সহোদর ছোটো ভাইটিকে এসময়ে মনে পড়বে না! রাসেল আবারও ফুঁপিয়ে ওঠে। অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে জয় এসে একবার কপালে হাত রাখলেই তো পারে! ছোট্ট তুলতুলে দুটি হাত। কী যে আদুরে ডাক- 'মামু'! কী হয় একবার এসে গলা জড়িয়ে ধরলে! আহা, ওইটুকু মানুষের সঙ্গে মধুমাখা কত স্মৃতিই না জড়িয়ে আছে!

রাসেলের ছোটো আপুর নাম রেহানা। না, তাকে বুবু ডাকে না রাসেল, আপু কিংবা ছোটো আপু বলে ডাকে। হাসুবুর কোলে জয় এসেছে সেই যুদ্ধের মধ্যে, তারপর থেকে রাসেলের প্রতি মনোযোগ একটুখানি কমে এসেছে। তাছাড়া সব সময় তো এ-বাড়িতে সে থাকে না। থাকে ছোটো আপু। বয়সে অনেক ছোটো, তবু রাসেল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গী। প্রিয় ছোটো ভাই। রাসেলের জন্যে কী-ই না করে সে! রাসেল পাখি ভালোবাসে বলে শেষ জন্মদিনে বাজার থেকে উচ্চমূল্য দিয়ে খুব চমৎকার এক ময়না পাখি এনে দেয় ভাইকে। বোল-ফোটা ময়না, দাম তো বেশি হবেই। তাও আবার সাধারণ কোনো বোল নয়। কে যেন সেই ময়নাকে খুব যত্ন করে 'জয় বাংলা' বলতে শিখিয়েছে। খুব স্পষ্ট তার উচ্চারণ, তবু কান খাড়া করে শুনলেই বুঝা যায় সে 'জয় বাংলা' বলতে চাইছে। ময়নার কণ্ঠে 'জয় বাংলা' শুনে রাসেল খুব আনন্দ পায়। ঘুরেফিরে ময়নার কাছে এসে সেও বার বার হাত উঁচিয়ে স্লোগান ধরে 'জয় বাংলা'। রমাভাই এত কাজের মাঝেও কখন যে গোপনে ময়নার সঙ্গে ভাব করেছে এবং একটি বাক্য শিখিয়েছে সে কথা কেউ টেরই পায়নি। হঠাৎ একদিন রাসেলের ইশকুলে যাবার সময় শোনা গেল। ময়না নতুন বোল ধরেছে । সে বলছে, ভাইয়া ইশকুলে যাবে।

রাসেল তো ভীষণ অবাক, একথা ওকে কে শেখাল! রমাভাই মুচকি মুচকি হাসে আর বলে এবার ইশকুলে না গিয়ে উপায় আছে!

মনে মনে ক্ষুব্ধ হয় রাসেল। ইশকুলে না যাবার কথা তো কখনো বলেনি সে! এ সব কথার মানে কী! বরং ইশকুলে না গেলেই তো খারাপ লাগে তার! বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয় না, কথা হয় না, রাজিয়া ম্যাডামের আদর পাওয়া হয় না। তখন এ বাড়িতেও ভালো লাগে না। রমাভাই নিজের ভুল বুঝতে পারে। ভেবেচিন্তে সে নতুন প্রস্তাব রাখে। ছোটো আপু যদি এবার আর একটা ময়না কিনে দেয়, তাহলে তাকে সে 'আমার সোনার বাংলা' শেখাবে। প্রস্তাব শুনে রাসেল তো মহাখুশি। লাফিয়ে ওঠে আনন্দে।

তার মানে আমাদের জাতীয় সংগীতও গাইতে পারবে?

পারবে পারবে।

রমাভাই আশ্বস্ত করে, চেষ্টা করলেই পারবে। তারপর কী মনে করে রাসেলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে,

কেন, এই সোনার বাংলা কি শুধুই আমাদের? পাখিদেরও নয়।

রাসেল বলে,

না না, তা কী করে হয়! আমাদের বইয়ে লেখা আছে এ দেশ পাখির দেশ, নদীর দেশ, ধানের দেশ, গানের দেশ।

রমাভাই বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা দেয়,

তবে যে! সোনার বাংলা ঠিকই পারবে।

তারপর কতদিন কেটে গেছে, সেই সোনার বাংলা গাওয়া ময়না পাখি আর কেনা হয়নি। কেন হয়নি সে কথা মনে করার চেষ্টা করে রাসেল কেন হয়নি? ছোটো আপু কি রাজি হয়নি! এমন পরিকল্পনার কথা শুনলে এ বাড়িতে কে আপত্তি করবে! মাথা খারাপ! আব্বাকে বললে তো সবার আগে তিনিই রাজি হবেন! 'আমার সোনার বাংলা' তার খুবই প্রিয় গান যে!

জ্বরের ঘোরে রাসেলের ভাবনাসূত্র এলোমেলো হয়ে যায়। ছোটো আপুকে মনে পড়ে, আবার পড়েও না। ধূসর হয়ে যায় স্মৃতির শামিয়ানা। রমাভাইয়ের মুখের ছবিও যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসে। খানিক চেনা আবার অচেনাও মনে হয়। এতটা জ্বরের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে রাসেল, এসময়ে একবার তার কপালে মমতার হাত ছোঁয়াবে না ছোটো আপু! কী হয়েছে রমাভাইয়ের, কাছে এসেও আসছে না কেন! কপালে জলপট্টি দিচ্ছে না, একটুও আদর করছে না, কী হয়েছে তার? আহা, চোখের ভেতরে এমন জ্বালা করছে কেন! এ কী অসহ্য জ্বালা! উহ, বাবা গো!

হঠাৎ মেহেদি রাঙা একটি হাত এগিয়ে আসে রাসেলের মাথার দিকে। হাত ভর্তি চুড়ি টুংটাং করে বেজে ওঠে। যেন পিয়ানো বেজে ওঠে নিকটে কোথাও। রাসেলের স্মৃতি থেকে ভেসে আসে সেতারবাদ্যের মধুর ধ্বনি। কিন্তু সেতারের ধ্বনি আর পিয়ানোর ধ্বনি কি এক হলো! পার্থক্য যা-ই থাক, ওই ধ্বনিতরঙ্গ ধেয়েই ভেসে আসে বড়ো ভাই এবং বড়ো ভাবির মুখ। এই মেহেদি রাঙা হাত কি তবে বড়ো ভাবি সুলতানা কামালের? সরু সরু আঙুল! নখে জেল্লাদার নেলপালিশ! হাতের তলায় আঙুলের ডগায় মেহেদির উল্কিতে নকশা আঁকা! কী মিষ্টি আলপনা! এ হাত নিশ্চয়ই সদ্যবিবাহিত ছোটো ভাবি রোজী জামালের। নতুন মানুষ, তবু রাসেলের সঙ্গে কী যে খুনশুটি! কী যে দুষ্টুমি! আদর-সোহাগে ছোটোদের জাপটে ধরে হাতের মুঠোয় ঠিকই মেহেদির ছোপ লাগিয়ে দেয়। জ্বরের ঘোরে রাসেলের সেই হাত ছোটো ভাবির হাতের কোমল পরশ খুঁজে ফেরে।

কী আশ্চর্য! বাড়িয়ে দেওয়া সেই হাতটা গেল কোথায়! দুই ভাবির সঙ্গেই রাসেলের কত না মধুর সম্পর্ক! দুজনের মধ্যে কেউ এগিয়ে আসবে না। মমতামাখা হাতের ছোঁয়া দিতে! কোনো কারণে সবাই কি তাকে ত্যাগ করেছে! পরিবারের সব চেয়ে ছোটো সদস্যকে এভাবে একাকী ফেলে যাবার কোনো মানে হয়! এই জ্বরতপ্ত শরীরে রাসেল এখন কী করে!

বিছানা থেকে উঠে বসতে ইচ্ছে করে রাসেলের। চেষ্টাও করে। কিন্তু সে পারে না।

বিছানা ছেড়ে নেমে আসতে ইচ্ছে হয় তার। এমন দুঃসময়ে কেউ তাঁর পাশে নেই। এই নিঃসঙ্গ পুরীতে সে থাকবে কী করে! রাতে ঘুমোবার সময় সে কি এ রকম একা ছিল! মা ছিল না পাশে! কিছুই মনে পড়ছে না কেন! আকাশ কাঁপানো জ্বর এলে কি সবারই এ রকম হয়!

প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেলে সে ভাবে, কী শুনতে সে কী শুনেছে তার কি ঠিক আছে! এখানে এই বত্রিশ নম্বর বাড়িতে গোলাগুলি আসবে কোত্থেকে! এখানে বাংলাদেশের স্থপতি বাস করেন সপরিবারে। সরকারি আবাসনের রাজকীয় নিরাপত্তা তো কখনো চাননি তিনি! গোটা জাতি তাঁকে পিতার সম্মানে ভূষিত করেছে, শ্রদ্ধায়-ভালোবাসায়-মমতায় নিরাপত্তা দিয়েছে। তাঁর বাড়িতে গোলাগুলি!

রাসেলের খুব ইচ্ছে করে বিছানা থেকে নেমে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু পা দুটো যে নামাতেই পারছে না সে! উঠে বসতেও পারছে না। এমনকি পাশ ফিরতেও পারছে না। শরীর তাঁর কথা শুনছে না মোটেই। তবু কী যে তার ইচ্ছের জোর, শরীরের বাধা না মেনে সে বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে।

প্রথমেই তার মায়ের ঘর। সেই ঘরের মেঝেতে চাপচাপ রক্তের মধ্যে লুটিয়ে পড়ে আছে তার গর্ভধারিণী মা। এ অবস্থায় মাকে দেখে সে প্রচণ্ড আঁতকে ওঠে। মা বলে জোরে চিৎকার করে। কিন্তু সে চিৎকার মোটেই স্ফুট হয় না, উচ্চারিত হয় না। দম বন্ধ হয়ে আসে রাসেলের। আতঙ্কে সে পালাতে চায়। কিন্তু পালাবে কোথায়! তার ডানে-বামে সামনে-পেছনে শুধু লাশ আর লাশ। লাল টকটকে রক্তধারার মধ্যে পড়ে আছে মায়ের লাশ, ভাইয়ের লাশ, ভাবির লাশ, নাসের কাকা, রমাভাই, বকুলসহ বাড়ি ভর্তি কাজের মানুষ– সবার নিস্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়ে আছে চতুর্দিকে।

সিঁড়ির কাছে পৌঁছুতেই রাসেলের চেতনা লুপ্ত হয়ে যায়। রক্তের আলপনা আঁকা সিঁড়ির উপরে পড়ে আছে তার বাবার বুলেটবিদ্ধ নিথর দেহ। চোখ থেকে ছিটকে পড়েছে তাঁর কালো ফ্রেমের প্রিয় চশমা। এই চশমা পরে তিনি নাকি বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ দেখতেন। হায় জনক! এমন অন্ধকার ভবিষ্যৎ কখনো কল্পনা করেছেন তিনি! চশমা তাঁকে আর কোন ভবিষ্যৎ দেখাবে!

রাসেলের প্রচণ্ড জ্বর। মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা। থেকে থেকে চেতনা হারায়, আবার চেতনা ফিরে পায়। নিঃসঙ্গ রাসেল এক সময় আবিষ্কার করে তার বুকের মাঝে বিশাল এক গহ্বর! সে যেন অচেনা কোন পাতালে নেমে যাওয়া সুড়ঙ্গপথ। সেই সুড়ঙ্গের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে নাড়ির বাঁধনে বাঁধা মা জননী।

চির অমর রাসেল আমার...

নাসির আহমেদ

রাসেল সোনা চাঁদের কণা ফুটফুটে এক শিশু
মায়ের আদর পিতার পরশ, চায় না সে আর কিছু।
মনটা জুড়ে কষ্ট কত এত্তটুকুন ছেলে!
পিতার পরশ পায় না মোটে, পিতা থাকেন জেলে।

পিতা এলেন বাড়ি ফিরে, যুদ্ধে স্বাধীন দেশ
ছোট্ট রাসেল বড়োই খুশি, নেই মনে আর ক্লেশ।
পিতার সাথে ছায়ার মতো আগলে থাকার আশা
সুযোগ পেলেই পিতার বুকে, নিবিড় ভালোবাসা!

সবুজ শ্যামল উঠোনজুড়ে প্রজাপতি ওড়ে,
সেই উঠোনে রাসেল সোনা সাইকেলে রোজ ঘোরে।
টুং টাং টুং বেল বাজিয়ে সাইকেলে তার খেলা
আদর-স্নেহে খেলাধুলায় যায় ফুরিয়ে বেলা।

ভাইয়ের স্নেহ, বোনের আদর, সবার ছোটো বলে
রাসেল সোনার ললাটজুড়ে চাঁদের প্রদীপ জ্বলে।
এমন সুখের পথচলা তার হঠাৎ গেল থেমে
পনেরো আগস্ট গভীর রাতে দানব এল নেমে!

মা-বাবা, ভাই-ভাবির সাথে ছোট্ট রাসেল সোনা
রক্তস্রোতেই ভেসে গেল, আর তো সে ফিরল না!
সাইকেলটা রইল পড়ে পথ চেয়ে তার একা!
কী অপরাধ ছোট্ট শিশুর! এও কি ললাট লেখা?

চিরকালের সেই অভিশাপ খুনির প্রতি ঘৃণা
চির অমর রাসেল আমার ভালোবাসার বীণা।

মনে পড়ে শেখ রাসেলকে

অদ্বৈত মারুত

মনে পড়ে সেই শিশুটির কথা বারে বারে
সেই শিশুটির মিষ্টি ছবি সবার হৃদয় কাড়ে!
সেই শিশুটির নাম তোমারও বেশ রয়েছে জানা
বিকেল হলে পাখির মতো মেলতো দুটি ডানা।

শেখ রাসেলের বয়স তখন হয়নি তো পার বারো
তোমার মতো উচ্ছলতায় কাটতো সময় তারও।
লতাপাতা, ফুল-পাখি আর প্রজাপতির সাথে
হেসে-খেলে কাটতো বেলা থামতো সন্ধ্যারাতে
তোমার মতোই বই নিয়ে সেও পড়তে যেত বসে
বাবার সাথে বিভিন্ন দেশ বেড়াতো সে চষে।
বলতে পারো আনন্দ আর হাসির মাঝেই বেলা
চলতো অতি ছোট্ট ছেলে রাসেলেরই খেলা।

রাসেল ছিল বাবা-মায়ের সবচেয়ে ছোটো ছেলে
বাবা হলেন শেখ মুজিবুর দিতেন আদর ঢেলে।
পরিবারের সবার আদর-ভালোবাসায় তাকে
জ্যোৎস্না ধোয়া রাতের তারা মুগ্ধ করে রাখে।
হাঁটি-হাঁটি, পা-পা করে উঠছিল সে বেড়ে
থামিয়ে দিলো ঘাতকেরা প্রাণটা নিলো কেড়ে!

বলছি শোনো আরও,
কান্না পাবে, চোখ হবে লাল, গাঢ়;
পঁচাত্তরের আগস্ট মাসের তারিখটা পনেরো
আসবে ঘাতক, কাড়বে জীবন পায়নি কেউই টেরও!
বাবা-মা, ভাই-ভাবি এবং আত্মীয়দের সাথে
তার সে ছোটো প্রাণখানিও কাড়লো কঠিন হাতে!

জানি, কাঁদছো বসে রাসেল রাসেল বলে
খুঁজছো তাকে রাত পোহালে নতুন সকাল হলে
ইতিহাসে রাসেল আছে, আছে সবার মাঝে
রাসেল আছে হাওয়ায় হাওয়ায় নিত্য সকাল-সাঁঝে।

প্রিয় রাসেল

প্রজীৎ ঘোষ

রাসেল তোমায় মনে পড়ে কার্তিকের এই দেশে;
সবুজ ছায়ায় লুটোপুটি খেলতে ভালোবেসে।
পিতার মতো বলতে কথা চলতে ন্যায়ের পথে;
তাইতো পিতা চুমু দিতো উঠিয়ে বুকের রথে।

পিতার সাথে যখন তুমি যেতে অন্য দেশে;
মায়ের কাছে বলতে সবই দিব্যি হেসে হেসে।
তোমার মাঝে দেখতো পিতা সকল শিশুর মুখ;
তাইতো পিতা তোমার মতো ঘুচায় সবার দুখ।

আজকে তোমার জন্মদিন কিন্তু তুমি নাই;
তোমার জন্য পাহাড় সমান দুঃখ বুকে পাই।
তোমার ছবি ভেসে ওঠে সকাল-দুপুর-সাঁঝে;
তুমি আছো থাকবে তুমি সকল শিশুর মাঝে।

রাসেল সবার অন্তরে

বশিরুজ্জামান বশির

ইতিহাসের পাতা উলটে
শেখ রাসেলকে পড়ি
শেখ রাসেলের মতো জীবন
আমরা সবাই গড়ি।

লেখাপড়া, গল্প বলায়
রাসেল অনেক ভালো
রাসেল হবার স্বপ্ন বুনে
দেই ছড়িয়ে আলো।

রাসেল আছে রাসেল রবে
রাসেল সবার অন্তরে
পনেরো আগস্ট স্বপ্ন দেখায়
বিশ্ববাসীর মন-তরে।

ঘাতকের নিষ্ঠুর বুলেট

মোহাম্মদ আজহারুল হক

রাসেল ছিল আদরের ছোটো সন্তান
তার পিতামাতার
ভাইবোনদের আদরের ছিল
প্রিয় ছিল সবার।

পনেরো আগস্ট বত্রিশ নম্বর বাড়িতে
সবার সাথেই ছিল
প্রিয়জনদের মারার সময় ঘাতকেরা
তাকে নামিয়ে নিলো।

রাসেল জানে না মা'কেও তার
মেরে ফেলেছে ঘাতক
মা'র কাছে যাওয়ার কথা রাসেল
বলেছিল হয়ে চাতক।

ঘাতকরা উপরে মা'র কাছে নিয়ে
কথা রেখেছে
রাসেল গিয়ে তার প্রিয়তমা মা'কে
মৃত দেখেছে।

মা'কে জড়িয়ে একটু কান্না করার
সুযোগটুকু সে পায়নি
ঘাতকের নিষ্ঠুর বুলেট রাসেলকে
সে সময়টুকু দেয়নি।

তর্জনী আঙুল

মুহাম্মদ ইসমাঈল

তোমার তর্জনী আঙুলের
তির্যক হুংকারে
স্বাধীন হলো দেশ।
তোমাদের যা কিছু আছে
তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।
মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি
রক্ত আরও দেবো।
এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো
ইনশাআল্লাহ।
একটি মাত্র শব্দ ইনশাআল্লাহ
আল্লাহ কবুল করলেন
দেশ স্বাধীন হলো
আমরা পেলাম প্রিয় নেতা
সুন্দর এক মানচিত্র।
যার নাম বাংলাদেশ।

প্রতিধ্বনি

হাসানাত লোকমান

বাঙালির বাঙালি তুমি, তুমি সূর্য সন্তান
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তুমি
হৃদয়ে হৃদয়ে শেখ মুজিবুর রহমান।

তুমি আসলে আর বাংলার মাটি বাঁধলো
স্বপ্ন আর সম্ভাবনার দুর্জয় ঘাঁটি,
তোমার পায়ের আওয়াজে মৃতপ্রায় পাখিও
চোখের গহ্বরে একটি সুখদিনের পতাকা
একটি মুক্তির গান, উদার সুনীল আকাশ আঁকার
প্রত্যয়ে বুক চিতিয়ে দেখালো সাহসে উচ্চকিত আঙুল।

স্বপ্নতো শূন্যে উড়ে না পাখা মেলে
স্বপ্ন তো শস্য অথবা বৃক্ষের বীজের মতো
রজঃশীলা মাটির বুকে অনিবার্য বপন বিষয়,
তুমি তাই করেছিলে, ফলশ্রুতিতে ব্যথা জর্জর বাঙালি
এবার স্বপ্ন ফলাও জীবনে জীবনে–
এমনি দারুণ চিৎকারে নেমে এল মাঠে-ঘাটে-পথে
নেমে এল সাথে নিয়ে যার যা আছে,
তুমি কাস্তের কথা বললে– নিয়ে এল
তুমি লাঠির কথা বললে– নিয়ে এল
তুমি দা-ছুরি-বল্লমের কথা বললে– নিয়ে এল।

রক্তের বন্যায় যদি ভাসে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা
যদি ধলেশ্বরী, মধুমতী কিংবা ব্রহ্মপুত্র ডাকনাম হারিয়ে ফেলে
যদি এক একেকটি নদীর নাম হয়ে যায় শহিদের নামে–
তবে তাই হোক, তবুও থাকবেই বুকে স্বপ্ন মঙ্গল গান
তবু আনবেই তারা পিতা তোমার স্বদেশ আরাধ্য স্বাধীনতা।

আমাদের স্বাধীনতা এল
আমাদের স্বদেশ এল লাশের সাথে ভেসে
তবুও থামে না ঘরে ঘরে কান্না, কোথায় গেল হাসি
সারা বাংলার বুকের ভেতর একই কথা
প্রতিধ্বনি–
মুজিব তোমায় ভালোবাসি
মুজিব তোমায় ভালোবাসি।

মা

আবুল কালাম আজাদ

বন্ধুরা ভুলে গেছে তাকে
আত্মীয়-পরিজনও ভুলে গেছে তাকে
স্মৃতিগুলো সব ফিকে;
কেবল মা–
দিন নেই রাত নেই
সকাল-সন্ধ্যা-দুপুর নেই
চেয়ে থাকে গোরস্থানের দিকে।

শতবর্ষের পদধ্বনি

নাসিমা আক্তার জাহান

কান পেতে সারাক্ষণ শুধু তোমার কণ্ঠই শুনি,
শুনি তোমার শতবর্ষের পদধ্বনি।
আর অধীর আগ্রহে শতবর্ষ পালনের দিনক্ষণ গুনি,
মুজিববর্ষকে হৃদয়ে নিয়ে শুধু স্বপ্নই বুনি।
মনে আছে উদ্যম উচ্ছ্বাস,
হৃদয়ে তোমারি বাস।
তোমার জন্মদিনের সেই শুভক্ষণ,
নিয়ে ভাবেনি কেউ তখন।
কেউ জানতোই না সর্বত্র হবে তোমারই পদচারণা,
হবে তোমারই স্বপ্নের বীজ বোনা।
ধীরে ধীরে সবাই দেখতে পেল তোমার বিদ্রোহী রূপ,
তুমি করে দিতে চাইলে আগ্রাসীর কণ্ঠ নিশ্চুপ।
তোমার বিদ্রোহী কণ্ঠের ঝঙ্কার
বেজে চলে বার বার।
আকাশে বাতাসে সে কণ্ঠ বেজেই চলে,
আর তোমার বিদ্রোহের কথা বলে।
শতবর্ষ থেকে সে বাণী যাবে হাজার বছরে,
প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে বাজবে সজোরে।
তোমার জন্মতিথি পালন হবে বার বার,
তুমি ফিরে আসবে আবার।
জন্মতিথি পালন হবে বাঙালি-হৃদয়ে,
অফুরন্ত ভালোবাসা দিয়ে।

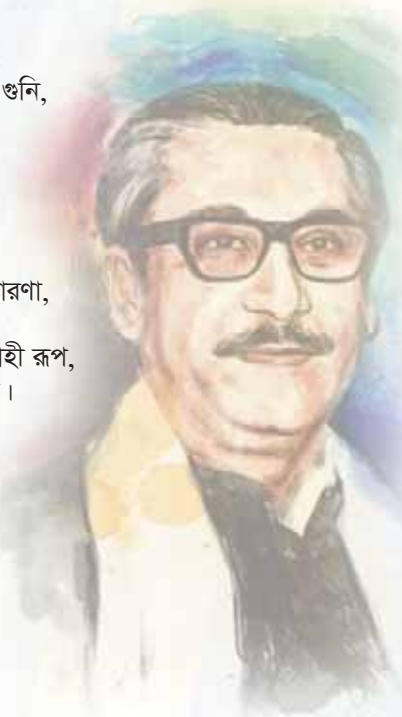

পথ ফিরে পাওয়া

হাসান হাফিজ

হয়ত কোথাও যাবো, যেতে হবে
কোন্‌খানে? ঠিক জানা নাই,
চিনপরিচয়হীন আকুল ঠিকানা
তার কিন্তু ঘোর আছে
আলুথালু সম্মোহনও আছে
গুপ্তিমন্ত্র জপ চলছে অবিরল
সাধ্য নাই কী করে ঠেকাই?
যেতে হবে, সংসার-সম্পদ সব ছেড়েছুড়ে
বৈরাগ্যের টান বড়ো সাংঘাতিক
তার কোনো মায়া নাই
পিছুটানও বলতে কিছু নাই
এ বিভ্রম, বিহ্বলতা চোরাবালি
কবে থেকে সমূহ প্রস্তুত
জাদুশব্দে মায়াস্পর্শে মোহিত সে
অল্পস্বল্প করতে পারেই
এই শক্তি তীক্ষ্ণ ও প্রবল জানি
ভয় পেয়ে কোনো লাভ নাই
যেতে হবে, যাওয়ার বিকল্প কিছু নাই
যেতে যেতে পথ যদি অলক্ষে হারাই
কী আশ্চর্য পুনরায়
আপনাআপনি ফিরে পেয়ে যাই...

জেগে ওঠা দৃশ্যপট

শাহরুবা চৌধুরী

অবশেষে আগ্নেয় শরীর জুড়ালো
রুপালি তপ্ত তুমুল বৃষ্টির পর
প্রশান্তির তুষারপাত দুধে মাখা ভাত
বহুকাল নিরন্ন থাকার চোখ
অনিকেত ক্লান্তির ধুপছায়া বয়ে চলা
অমল কোমল স্রোতোধারায়
উত্তাপহীন নক্ষত্র নীলে মেঘের ভেলায়
কবিতার হাটবাজার মানে না
সময় কি অসময়ের নীতিমালা
শুধু অন্য রকম এক সুখের বার্তা
ভুলে যাওয়া সব ব্যবধান
হেমন্তের সকালে এসে আমাকে ডাকে
শুভ্রতার বুকে উদাসীন হয়ে
নিয়তির আঁচলে মেখে দিতে রংধনু
কোনো এক সমতল পাহাড়ের চূড়ায়
অবাক জেগে ওঠা দৃশ্যপট।

এক পেয়ালা অনুভূতি

আন্‌ওয়ার হুসাইন

কিছুক্ষণ আগে যা শূন্য ছিল আবার যদি
রিক্ত হয়ে যায়– 'তাই দেইনি তাকে রজনীগন্ধার গুচ্ছ'
অনেকবার দেখেছি তাকে
চাঁদনী-রাতের মতো ঘুমন্ত মুখ, ডাকিনি–
একবারও, যদি চোখ না খুলে কখনো।

মন মায়া জানে বলে পদ্ম ছিঁড়ে আনি,
বুক ভরা শাওনের মেঘ, সেখানে কান্না
লুকিয়ে রাখি। সুপেয় এক পেয়ালা অনুভূতি।

রাত-দিনে সহস্র চুমুকেও নিঃশেষ হতে চায় না
হৃদয়ের ধর্ম বুঝি এমনই– শূন্য হবার ভয়
বিশ্বময় করোনার ঢেউ কেড়েছে প্রিয়জন অদৃশ্য
সেই কারুকার নির্মাণ করেছে অন্য আকাশ
তবু আশা, ভালোবাসায় গড়ে স্বর্গ পুষ্পের স্বগোত্র।

আলোর কুসুম

দেলওয়ার বিন রশিদ

আপনি আলোর কুসুম, আপনার সৌরভ সুধায়
কলুষিত পৃথিবী হয়ে ওঠে পবিত্র
স্নিগ্ধ সুন্দর,
আপনার নামের মহিমায় ঘুচে যায় দৈন্যতা
দুঃখ-কষ্ট,
তাপিত অন্তরে বয়ে যায় শান্তির অমিয়ধারা,
আলোর ফোয়ারা আপনি
আপনার নামে আলোকিত হয় পথ
পথহারা খুঁজে পায় পথের দিশা,
আপনার মুখ নিঃসৃত মধুর ও পবিত্র বাণী
ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীজুড়ে
ছড়ায় শান্তি,
বিশ্বাসী হৃদয়ে আপনি প্রদীপ
আপনি প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,
সর্বদা আপনার নামে দরুদ ও সালাম।

পদ্মা সেতু

খোরশেদ আলম নয়ন

পদ্মা সেতু স্বপ্নের সেতু
বিনা সুতোর এক মালা,
পদ্মা সেতু ভাটি বাঙালির
দিন বদলের পালা।

পদ্মা সেতু পদ্মার বুকে
মোহনীয় বাতিঘর
পদ্মা সেতু লক্ষ প্রাণের
স্বপ্ন স্বনির্ভর।

পদ্মা সেতু বিরহ ব্যাকুল
হৃদয়ের অবসান,
পদ্মা সেতু রংধনু রং
জীবনের জয়গান।

পদ্মা সেতু একই মোহনায়
দুইটি হিয়ার প্রান্ত
স্বনির্ভরতার এ যে অপরূপ
অনুপম দৃষ্টান্ত।

এপার-ওপার প্রিয় হারাবার
দিনকে করেছি জয়
পদ্মা-মেঘনা-যমুনাই
বীর বাঙালির পরিচয়!

নিধুয়া পাথার কান্দে

মিয়াজান কবীর

নিধুয়া পাথার কান্দে, কান্দে বেথুয়া নদী,
চোখে তার ব্যথার জল ছলছল বহে নিরবধি।

বেথুয়া কী রাঁধতে বসে ধোঁয়ার ছলে কান্দে?
দীঘল চুলে জরির ফিতায় আজ খোঁপা বান্ধে!
বলতাম তারে এসব কথা দেখা পেতাম যদি
নিধুয়া পাথার কান্দে, কান্দে বেথুয়া নদী।

দেখেছি বেথুয়ার মাথায় কাজল কালো চুল
কালো চুলের খোঁপায় গুঁজে দিয়েছি জুঁই-বকুল
সেদিনের কথা মনে পড়ে আজও অবধি
নিধুয়া পাথার কান্দে, কান্দে বেথুয়া নদী।

বেথুয়া পেয়ে নতুন বর সাজিয়েছে বাসর,
ছলনার ছলে চলে গেছে আমায় করে পর
বিরহ-ব্যথায় আমার চোখ হয়েছে জলধি
নিধুয়া পাথার কান্দে, কান্দে বেথুয়া নদী।

ডাকছে আমার দেশ

নিকুঞ্জ কুমার বর্মন

ডাকছে আমার মাটি, ডাকছে আমার দেশ,
এ মাটিতে জন্ম আমার জীবন করব শেষ।
বসন্তেরি আম বাগানে, সুগন্ধি মুকুল,
গ্রীষ্মে পাকে আম-কাঁঠাল, ফুটে যে বকুল,
ফুল বাগানে তরুণীদের মাথায় বিনিকেশ।
ডাকছে আমার মাটি, ডাকছে আমার দেশ।
বর্ষাকালে ব্যাঙের ডাকে, মন যে হয় ব্যাকুল,
শরৎকালে নদীর ধারে, ফুটে কাশের ফুল,
পথ চলে নতুন বধূ গায়ে সুন্দর বেশ।
ডাকছে আমার মাটি, ডাকছে আমার দেশ।
হেমন্তেরি সোনালি ধান, মাঠেতে বিলকুল,
শীতকালে তুষার রাতে, কান্দেরে বুলবুল,
মায়ের কোলে ছোটো শিশু মমতার নাই শেষ।
ডাকছে আমার মাটি, ডাকছে আমার দেশ।
এই দেশেতে ছবি আঁকতেন শিল্পী জয়নুল,
এই মাটিতে ঘুমিয়ে আছেন কবি নজরুল,
এসো গড়ি সবে মিলি সোনার বাংলাদেশ।
ডাকছে আমার মাটি, ডাকছে আমার দেশ।

প্রবীণ ব্যক্তিরা সমাজের শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ব্যক্তি

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বিশ্বব্যাপী চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতিতে সমগ্র বিশ্বে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর সব দেশেই প্রবীণদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। প্রবীণ ব্যক্তিরা সমাজের শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁদের শ্রম ও মেধায় সভ্যতার অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ১লা অক্টোবর ২০২১ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে ৬ই অক্টোবর ২০২১ বঙ্গভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাক্ষাৎ করেন। এসময় রাষ্ট্রপতির সহধর্মিণী রাশিদা খানম উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস-২০২১' পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রবীণ নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সংবিধানে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করেন। এ ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ সালে তৎকালীন সরকার বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করে, যার আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রান্তিক পর্যায়ে প্রায় ৪৯ লক্ষ প্রবীণ নাগরিক ভাতা পেয়েছেন। চলমান অর্থবছরে এর আওতা আরও বাড়ানো হয়েছে। সরকার ২০১৪ সালে প্রবীণ ব্যক্তিদের সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৫ প্রণয়ন করেছে। সরকারের গৃহীত এসকল পদক্ষেপ প্রবীণদের কল্যাণে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ বছর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্য 'Digital Equity for All Ages' অর্থাৎ 'ডিজিটাল সমতা সকল বয়সের প্রাপ্যতা' যথার্থ হয়েছে বলে জানান রাষ্ট্রপতি। বাংলাদেশ ও বিশ্বের সকল প্রবীণ ব্যক্তির সুস্বাস্থ্য ও শান্তিময় জীবন কামনা করেন রাষ্ট্রপতি।

তথ্যপ্রাপ্তি ও জানা প্রতিটি মানুষের সাংবিধানিক অধিকার

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক্‌স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। তথ্যপ্রাপ্তি ও জানা প্রতিটি মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। তথ্যের অবাধ প্রবাহ যেমন নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর জনগণের ক্ষমতায়নকেও সুদৃঢ় করে। জনগণের এ অধিকারকে প্রাধান্য দিয়েই সরকার 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' প্রণয়ন এবং আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। ২৮শে সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২১' উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। এবারের প্রতিপাদ্য– 'তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার'।

রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এ আইন আবশ্যিকভাবে তথ্যপ্রাপ্তিতে জনগণকে দিয়েছে আইনি ভিত্তি। তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য কমিশনের পাশাপাশি দেশের সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, নাগরিক সমাজ, জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার আইন পরিপূর্ণতা পেতে পারে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিববর্ষের এই শুভক্ষণে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য সকলকে ধৈর্য, সাহস ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বাস্থ্যবিধি মানার নির্দেশ

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সশরীরে শিক্ষা কার্যক্রম চালুর ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষ, ছাত্রাবাস, ক্যাম্পাস, অফিসসহ সর্বত্র যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মানা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। করোনা পরিস্থিতির কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) সশরীরে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০২১ বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করতে গেলে রাষ্ট্রপতি এ নির্দেশ দেন।

রাষ্ট্রপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মোঃ আবদুল হামিদ স্বল্প সময়ের মধ্যে সব শিক্ষার্থীর টিকাদান সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ ও মনিটরিংয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। সাক্ষাৎকালে ঢাবি উপাচার্য রাষ্ট্রপতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় অবহিত করেন। এছাড়া উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠেয় বর্ণাঢ্য আয়োজনের প্রস্তুতি বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

একনেকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্পের সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই অক্টোবর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। সভায় কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্পের সংশোধনী প্রস্তাব-এর অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রকল্পের নির্মাণ কাজের অনিয়মে যারা জড়িত, তাদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। এমনকি যদি কেউ অবসরে যায় তাকেও শাস্তির আওতায় আনার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।

জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১১৯ এবং ১২০তম আইন ও প্রশাসন প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনের নবীন কর্মকর্তাদের কোর্সের জ্ঞান কাজে লাগানোর এবং সাধারণ জনগণের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করার আহ্বান জানান। জনগণের কাছে প্রকৃত সেবা পৌঁছে দিতে মাঠপর্যায়ে যাওয়ার আগে কর্মকর্তারা যেন প্রশিক্ষণ নিয়ে যেতে পারেন এবং তাদের কাজ বুঝে নিতে পারেন সেজন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দের চুল্লিপাত্র স্থাপন কাজের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই অক্টোবর পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার রূপপুরে নির্মাণাধীন দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রাণ বলে খ্যাত 'পরমাণু চুল্লিপাত্র' স্থাপন কাজের উদ্‌বোধন করেন। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ কাজের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য সঞ্চালন লাইন নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। পরমাণু শক্তি আমরা শান্তির জন্য ব্যবহার করব। পরমাণু শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। সেটা গ্রামের মানুষের কাছে যাবে। তাদের আর্থসামাজিক উন্নতি হবে। বিদ্যুৎকে দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি আখ্যায়িত করেন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সরকার দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে দেশের দক্ষিণাঞ্চলেই আরেকটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির করার কথা উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই অক্টোবর ২০২১ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ইউনিট-১-এর রিঅ্যাক্টর প্রেসার ভেসেল স্থান কাজের উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির ৫০ বছর পদার্পণ ও আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দুর্যোগের ঝুঁকি বিষয়ে সবাইকে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান এবং যতই ঝুঁকি আসুক দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, দেশের উন্নয়ন ছাড়াও দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে। দারিদ্র্যের হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চারটি ইউনিটের ও উদ্‌বোধন করেন। এগুলো হচ্ছে– দ্রুত সাড়াদান ইউনিট, পানি থেকে উদ্ধার ইউনিট, অতি জোয়ার মনিটরিং ও খেলায় খেলায় দুর্যোগ ইউনিট। এছাড়া 'দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে শেখ হাসিনা' শীর্ষক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

বিদেশি চ্যানেলে ক্লিনফিড বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট

আইন অনুযায়ী দেশে বিদেশি চ্যানেলগুলোর বিজ্ঞাপনমুক্ত (ক্লিনফিড) সম্প্রচার বাস্তবায়নে ১লা অক্টোবর থেকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। ৩০শে সেপ্টেম্বর সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইন প্রয়োগে এ ব্যবস্থার কথা জানান তিনি।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ১লা অক্টোবর থেকে সারা দেশে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। কোনো বিদেশি চ্যানেলে ক্লিনফিড দেখানো না হলে এবং মন্ত্রণালয়, টেলিভিশন ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন ও ক্যাবল অপারেটর ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের মাধ্যমে ক্যাবল লাইনে সম্প্রচারের

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২১ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে কবি ও সাংবাদিক সৌমিত্র দেব সম্পাদিত 'উন্নয়নে উজ্জীবনে শেখ হাসিনা' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন– পিআইডি

জন্য টেলিভিশনগুলোর নির্ধারিত ক্রমের ব্যত্যয় হলে বা কোনো ক্যাবল অপারেটর আইন ভঙ্গ করে নিজেরা বিজ্ঞাপন, অনুষ্ঠান প্রদর্শন করলে বা আইনের অন্য কোনো ব্যত্যয় ঘটালে সংশ্লিষ্ট চ্যানেল ডাউনলিংকের অনুমতিপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিবিউটরদের এবং ক্যাবল অপারেটরদের ওপরই আইন ভঙ্গের দায় বর্তাবে এবং আগামীকাল থেকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, যারা বিদেশি চ্যানেল ডাউনলিংকের অনুমতি পেয়েছে ক্লিনফিডের ব্যাপারে তাদের সাথে গত আগস্ট মাসে বৈঠক করে আমরা জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, ১লা অক্টোবর থেকে সরকার আইন প্রয়োগ করবে। দিনের পর দিন তারা সময় নেবে, কালক্ষেপণ করবে, এটি হয় না। ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, নেপালসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে ক্লিনফিড ছাড়া বিদেশি চ্যানেল কেউ দেখাতে পারে না। আর আমাদের দেশে-বিদেশি চ্যানেলগুলো ক্লিনফিড পাঠাচ্ছে না, এই অজুহাতে এখানে ক্লিনফিড চালাবে না–এটা হয় না। ১লা অক্টোবর থেকে বাংলাদেশে ক্লিনফিড সম্প্রচার কার্যকর করার বিষয়টি সম্প্রতি দিল্লি সফরকালে ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীকেও জানিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

সম্প্রতি সরকারি এবং নিবন্ধিত অনেকগুলো অনলাইন নিউজপোর্টাল বিটিআরসি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল, এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে মন্ত্রী বলেন, একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল এবং সেটি খুব দ্রুততার সাথে নিরসন হয়েছে। অনলাইন পোর্টাল বন্ধ করা এবং অনুমোদন দেওয়া দুটিই চলমান প্রক্রিয়া। যে অনলাইন পোর্টালগুলো গর্হিত কাজ করে কিংবা সৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয় কিংবা গুজব রটায়, সেগুলো বন্ধ করা চলমান প্রক্রিয়া। এর অংশ হিসেবে আমরা খুব সহসা বিটিআরসিকে তালিকা দেব। সেই সাথে আদালতকেও আমরা জানাবো যে এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া এবং সবগুলো একসাথে বন্ধ করে দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত হবে, তা ভাবার প্রয়োজন রয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এর আগে কবি ও সাংবাদিক সৌমিত্র দেব সম্পাদিত *উন্নয়নে উজ্জীবনে শেখ হাসিনা* গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। এসময় মন্ত্রী গ্রন্থটি সংকলন ও সম্পাদনার জন্য সৌমিত্র দেবকে অভিনন্দন জানান।

মানুষের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করেছেন শেখ হাসিনা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, দেশের মানুষের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। 'তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার'– প্রতিপাদ্য নিয়ে ২৮শে সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২১' উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে তথ্য কমিশন আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মো. মকবুল হোসেন। আলোচনায় অংশ নেন তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম এনডিসি এবং ড. আবদুল মালেক। সকল বক্তা প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ২৮শে সেপ্টেম্বর যেমন তথ্য অধিকার দিবস একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মানুষের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই ২০০৯ সালে যখন আমরা সরকার গঠন করি তখনই সংসদে তথ্য কমিশন আইন পাস হয় এবং সেই আইন বলে তথ্য কমিশন গঠিত হয়েছে। তথ্য কমিশন গঠন করার মাধ্যমে দেশের মানুষের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

২০১৪ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে ১ লাখ ২১ হাজার আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে জানিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, এজন্য কোনো মন্ত্রণালয়ে গিয়ে কোনো ফাইলের ছবি তোলারও প্রয়োজন নেই বা ফাইল থেকে কাগজ লুকিয়ে পাচার করারও প্রয়োজন নেই। সেটি যদি কোনো মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া না হয় এবং সেটি যদি এমন তথ্য না হয় যে সেটি রাষ্ট্রের গোপনীয় দলিল, সেটি দিতে মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর কিংবা কোনো বেসরকারি দপ্তর সেটি দিতে বাধ্য। আর যদি কোনো কারণে না দেয় তাহলে তথ্য কমিশনে আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ আছে।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে রচিত সংবিধানের ৩৯ ধারায় মানুষের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলেছেন। সেই আলোকেই পরে তথ্য অধিকার আইন করা হয় এবং তথ্য কমিশন গঠন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশ রচনা করে গেছেন তা নয়, তিনি আমাদেরকে এমন একটি সংবিধান দিয়ে গেছেন যে সংবিধানে জনগণকে রাষ্ট্রের মালিকানা দেওয়া হয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সংবিধান যেটি ১৯৭২ সালের সংবিধান পরবর্তীতে যেটি অনেক কাঁটা-ছেঁড়া করা হয়েছে, কাঁটা-ছেঁড়া করে পরবর্তীতে সেই সংবিধানের মূল চরিত্র নষ্ট করা হয়েছে, যদিওবা মূল চরিত্র আমরা অনেকটা ফিরিয়ে এনেছি। সেই সংবিধানে রাষ্ট্রের প্রতিটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একারণে সেটি সত্যিই অনন্য এবং খুব কম রাষ্ট্রের সংবিধানে এরকম আছে।

সভাপতির বক্তৃতায় প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ বলেন, তথ্য জানার অধিকার এখন মানুষের মৌলিক অধিকারের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের সেই অধিকার নিশ্চিত করেছেন, একারণে তাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

করোনাকালেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এগিয়ে বাংলাদেশ

করোনাভাইরাস মহামারি কবলিত অর্থনৈতিক স্থবিরতা কাটিয়ে ফের গতিশীল হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া। অর্থনীতিতে করোনার আঘাত পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা কঠিন। এমন কঠিন সময়েও দারুণ কৃতিত্ব দেখিয়ে অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে বাংলাদেশের। উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার বেশির ভাগ দেশকে আবারও পেছনে ফেলবে বাংলাদেশ। ৭ই অক্টোবর বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত দক্ষিণ এশীয় অর্থনীতি বিষয়ক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শুধু বাংলাদেশের (জুলাই-জুন) জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ইতিবাচক ধারায় ৩ দশমিক ৫ শতাংশ। এসময় এ অঞ্চলের বাকি দেশগুলোরই প্রবৃদ্ধি ছিল নেতিবাচক।

করোনা পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসায় ইতিবাচক ধারায় ফেরে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতি। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ শতাংশ, ভারতের ৮ দশমিক ৩ শতাংশ, নেপালের ১ দশমিক ৮ শতাংশ, পাকিস্তানের ৩ দশমিক ৫ শতাংশ, মালদ্বীপের ২২ দশমিক ৩ শতাংশ ও শ্রীলংকার ৩ দশমিক ৩ শতাংশ।

বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস অনুসারে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরেও বাংলাদেশ আশাব্যঞ্জক গতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। এসময় বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। অন্যদিকে ভারতের প্রবৃদ্ধি কমে হবে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস আরও বলেছে, আগামী বছরগুলোয় দক্ষিণ এশিয়ার বাকি দেশগুলো অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে উত্থান-পতন দেখলেও সুষমগতিতে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের জন্য কাজ করবে জাতিসংঘ

ভাসানচরে বসবাসকারী মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য কাজ শুরু করতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারের (ইউএনএইচসিআর) সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। ৯ই অক্টোবর সচিবালয়ে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোহসীন এবং ইউএনএইচসিআর-এর পক্ষে বাংলাদেশস্থ প্রতিনিধি উহানেস ভন ডার ক্লাও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

এ সমঝোতার ফলে বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনএইচসিআর যৌথভাবে ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের খাদ্য ও পুষ্টি, সুপেয় পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, চিকিৎসা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, মিয়ানমারের ভাষায় পাঠক্রম ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং জীবিকায়নের ব্যবস্থা করবে। ইউএনএইচসিআর যুক্ত হওয়ায় ভাসানচর ও কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। সমঝোতা স্মারক সই হওয়ার ফলে কক্সবাজারের অনেক রোহিঙ্গা ভাসানচরে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মো. এনামুর রহমান বলেন, ১৯৯১-১৯৯২ সালে শুরু হয়ে ২০১৭ সালের ২৫শে আগস্ট পর্যন্ত এবং এর পরবর্তী সময়ে মিয়ানমার থেকে আসা প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গাকে মানবিক সহায়তা দিয়ে আসছে বাংলাদেশ। জনসংখ্যার অতি ঘনবসতি ও পরিবেশের ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এক লাখ রোহিঙ্গার জন্য ভাসানচরে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভাসানচর কিংবা কক্সবাজারে মিয়ানমার নাগরিকদের থাকার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সাময়িক। আমাদের মূল লক্ষ্য মিয়ানমারের এসব বাস্তুচ্যুত নাগরিককে মিয়ানমারে দ্রুত প্রত্যাবাসন।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

কৃষক স্বল্প সুদে ঋণ পাবেন

করোনার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষকের জন্য তিন হাজার কোটি টাকার বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ তহবিল থেকে জামানতবিহীন সহজ শর্তে মাত্র ৪ শতাংশ (সরল হারে) সুদে ঋণ নিতে পারবেন কৃষকরা। ১৪ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষিঋণ বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত নীতিমালা দিয়ে একটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব এ তহবিলের মেয়াদ হবে আগামী বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত। ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে শস্য ও ফসল চাষের জন্য এককভাবে জামানতবিহীন (শুধু ফসল দায়বন্ধনের বিপরীতে) সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা ঋণ বিতরণ করা যাবে। ঋণখেলাপিরা এ স্কিমের আওতায় ঋণ পাবেন না। কৃষক পর্যায়ে শস্য ও ফসল খাতে বিতরণ করা ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ১২ মাস। এছাড়া অন্যান্য খাতে বিতরণ করা ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ন্যূনতম তিন মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৮ মাস।

পোশাক শিল্পে সবুজ বিপ্লব

দেশে বিপুল বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্প বিপ্লবের রূপকল্প নিয়ে কাজ করছে সরকার। যদিও করোনা মহামারি বিশ্বের পাশাপাশি এ দেশের অর্থনীতিকেও গতিহীন করে ফেলেছে। তবে এসবের পরও দেশের বেশির ভাগ রপ্তানি আয়ের খাত হিসেবে তৈরি পোশাক শিল্প এগিয়ে যাচ্ছে। তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ সূত্রে জানা যায়, দেশের পোশাক শিল্পে সবুজ বিপ্লব ঘটছে। ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের (ইউএসজিবিসি) পরিবেশবান্ধব কারখানার বিচারে বিশ্বের সেরা ১০ কারখানার মধ্যে সাতটি বাংলাদেশের। সাতটি তৈরি পোশাক কারখানা হচ্ছে– এনভয় টেক্সটাইল, রেমি হোল্ডিংস, প্লামি ফ্যাশনস,

ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিও, এসকিউ সেলসিয়াস, জেনেসিস ফ্যাশনস ও জেনেসিস ওয়াশিং এবং এসকিউ কোলবেন্স ও এসকিউ বিরিকিনা। এছাড়া সম্প্রতি নতুন করে আরও তিনটি সবুজ কারখানা যুক্ত হয়ে দেশের মোট সবুজ কারখানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪৮-এ। নতুন এই তিনটি সবুজ কারখানা হচ্ছে– সায়হাম নিট কম্পোজিট অ্যান্ড সায়হাম স্যুটস লিমিটেড, ফ্লেক্সেন ড্রেস মেকার লিমিটেড এবং ফেবিটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।

জেলেদের জন্য ভিজিএফ বরাদ্দ

প্রজনন উপলক্ষে আগামী ৪ থেকে ২৫শে অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিন ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ থাকবে। এসময় বেকার হয়ে পড়া জেলেদের জন্য ১১ হাজার ১১৮ দশমিক ৮৮ মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ২৭শে সেপ্টেম্বর সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে এ সংক্রান্ত মঞ্জুরি বরাদ্দ করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সরকারের মানবিক খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ৩৭ জেলার ১৫১টি উপজেলায় মা ইলিশ আহরণে বিরত থাকা ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৯৪৪টি জেলে পরিবারের জন্য এ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর আওতায় প্রতিটি জেলে পরিবার ২০ কেজি করে চাল পাবে। ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শুরু পূর্বেই এ বছর ভিজিএফ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

কম্পিউটারের টুলস বাংলায় রূপান্তরের আহ্বান

প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষায় প্রকৌশল-বিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয় বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান এবং কম্পিউটারের টুলসগুলো বাংলায় রূপান্তরের আহ্বান জানিয়েছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

২৪শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় বিডিওএসএন আয়োজিত স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামের বাংলা সংস্করণের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। এসময় ডিজিটাল প্রযুক্তি বাংলায় ব্যবহার করার জন্য যারা অবদান রেখেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্ত্রী ডিজিটাল যুগকে বাংলা ভাষার যুগে রূপান্তর করার আহ্বান জানান।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক ৬ই অক্টোবর ২০২১ আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে 'ইন্টারন্যাশনাল ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড-২০২১' উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। বাংলায় স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামিং টুলস উদ্ভাবন শিশুদের প্রোগ্রামিং শেখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। ছোটোদের জন্য প্রোগ্রামিং শিক্ষায় সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার হতে পারে স্ক্র্যাচ। তিনি এ ব্যাপারে প্রযুক্তিবিদ, শিক্ষাবিদ, সরকার ও ট্রেডবডিসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী এসময় ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর জাতি নির্মাণে শৈশব থেকেই প্রোগ্রামিং শেখার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, প্রাথমিক স্তরে প্রোগ্রামিং শুরু করতে পারলে উচ্চশিক্ষায় তার ভালো সুফল পাওয়া সম্ভব। সবাইকে কম্পিউটার প্রোগ্রামার হতে হবে তা নয়, কিন্তু স্ক্র্যাচ শিক্ষার্থীদের জন্য সব ক্ষেত্রেই একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

মন্ত্রী পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুদের প্রযুক্তি উপযোগী শিক্ষায় গড়ে তুলতে প্রাথমিকভাবে ৬৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের ২৮ পাড়াকেন্দ্রে ডিজিটাল শিশু শিক্ষা কার্যক্রম ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উদ্যোগ শুরু করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

ডিজিটাল ইকোনমি গড়ে তুলতে রোবটিকসকে প্রাধান্য দিতে হবে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প: ২০৪১ বাস্তবায়নে ডিজিটাল ইকোনমি গড়ে তোলা অপরিহার্য। সে লক্ষ্য অর্জনে রোবটিকসকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের আগামী দিনের লক্ষ্য হচ্ছে, ডিজিটাল ইকোনমি ও নলেজ বেইজড সোসাইটি গড়ে তোলার মাধ্যমে স্মার্ট নেশন বিনির্মাণ করা। ২৭শে সেপ্টেম্বর ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে '৪র্থ বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড-২০২১'-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, গত ১২ বছরে প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের নেতৃত্বে আইসিটি খাত শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে। এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যন্ত ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি পৌঁছে গেছে। ফলে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১২ কোটি দাঁড়িয়েছে এবং ই-গভর্ন্যান্সে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে। ১২ বছর আগে বাংলাদেশ ছিল প্রযুক্তিবিহীন, দুর্নীতিগ্রস্ত দরিদ্র রাষ্ট্র। কিন্তু সজীব ওয়াজেদ জয়ের দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ প্রযুক্তিনির্ভর, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ।

তিনি জানান, রোবটিকস সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষা দিতে দেশে ৩০০টি স্কুল অব ফিউচার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, যা ২০২২ সাল থেকে চালু করা হবে। মানুষের জীবনের ঝুঁকি থাকে এমন কাজগুলোতে রোবটের আরও বেশি ব্যবহার বাড়নোর জন্য অর্থায়নসহ তরুণ শিক্ষার্থী ও গবেষকদের উৎসাহিত করতে হবে। আগামী বছর দেশে একটি রোবটিকস উৎসব করা হবে বলেও জানান তিনি।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

সিলেটের পান রপ্তানি হবে ব্রিটেনে

সিলেট অঞ্চলে উৎপাদিত পান রপ্তানি হতো ব্রিটেনে। তবে ব্রিটেনের নিষেধাজ্ঞার কারণে দীর্ঘদিন ধরে সে দেশে পান রপ্তানি বন্ধ ছিল। এতে ক্ষতির মুখে পড়েন এখানকার ব্যবসায়ীরা। অবশেষে ব্রিটেন বাংলাদেশি পানের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে যাচ্ছে। ফলে পান খেয়ে মুখ লাল করবে সে দেশের বসবাসকারী এশিয়ানরাও। দেশটির পান রপ্তানির ইস্যু দেখভালকারী সংস্থা 'ইউকে- ফুড স্ট্যান্ডার্ড এজেন্সি' (এফএসএ)-এ বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে। সব কিছু ঠিক থাকলে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই সুসংবাদ পেতে পারেন দেশের পান রপ্তানিকারকরা।

কুমিল্লার কচুর লতি যাচ্ছে বিদেশে

কচুর লতি উৎপাদন ও বিক্রি করে কুমিল্লার বরুড়ার কৃষকরা আজ বেশ স্বাবলম্বী। এই লতিই তাদের লাভের মুখ দেখিয়েছে। বরুড়ার লতি শুধু কুমিল্লায় নয়, দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। বিশেষ করে এ কচুর লতি যাচ্ছে ইংল্যান্ড, ইতালিসহ ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। জেলার বরুড়ায় লতি চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকের। তাদের দাবি, এলাকায় একটি প্রসেসিং সেন্টার হলে লতি দুই-তিন দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাবে।

জানা যায়, কুমিল্লার বিভিন্ন উপজেলায় ৩০০ হেক্টর জমিতে কচুর লতি চাষ হচ্ছে। তার মধ্যে বরুড়া উপজেলায় চাষ হচ্ছে ২৫০ হেক্টর জমিতে। প্রতি হেক্টরে উৎপাদন হয় ২৫ টন লতি, সে হিসাবে ৩০০ হেক্টরে উৎপাদন হচ্ছে সাড়ে সাত হাজার টন লতি। বরুড়া ছাড়া আদর্শ সদর, চান্দিনা ও বুড়িচংয়ের উল্লেখযোগ্য জমিতে লতি চাষ হচ্ছে। বছরে সাত থেকে আট মাস লতি তোলা যায়।

বরুড়া উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ঘরে ঘরে লতি তোলা, পরিষ্কার ও বাঁধাইয়ে ব্যস্ত কৃষক-কৃষানিরা। নরিন গ্রামে পুরুষরা জমি থেকে লতি তুলে বাড়ি আনছেন। ঘরের সামনে নারীরা লতি পরিষ্কার করছেন। একই চিত্র উপজেলার রাজাপুর, জালগাঁও, বাতাইছড়ি, শরাফতি, পদুয়া ও হরিপুর গ্রামেরও। এখানে প্রতিদিন ৪০ টনের বেশি লতি সংগ্রহ করেন ব্যবসায়ীরা।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

শিক্ষার্থীদের বেতন নিয়ে চাপ দেওয়া যাবে না

করোনা পরিস্থিতি ও ডেঙ্গুর প্রকোপ থেকে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার জন্য প্রায় ৫৪৩ দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে সরকার। ১২ই সেপ্টেম্বর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হয় স্বাস্থ্যবিধি মানার নির্দেশনা দিয়ে। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ১২ই সেপ্টেম্বর আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিদর্শনে যান।

করোনা মহামারি মোকাবিলায় দীর্ঘ ছুটি শেষে ১২ই সেপ্টেম্বর ২০২১ দেশব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার প্রথম দিনে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ঢাকার আজিমপুর গভর্নমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন– পিআইডি

পরিদর্শনকালে মন্ত্রী বলেন, করোনাকালে অনেকের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তাই শিক্ষার্থীদের বেতন নিয়ে অভিভাবকদের যেন চাপ দেওয়া না হয়। কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ স্বাস্থ্যবিধি মানায় অবহেলা করা হলে তার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী।

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখার খসড়া উপস্থাপনা সভায় প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই সেপ্টেম্বর গণভবন থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখার খসড়ার উপস্থাপনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা নেই, মাধ্যমিকে থাকছে না বিভাগ, পড়তে হবে অভিন্ন ১০ বিষয়, বিষয় বিভাজন একাদশ শ্রেণি থেকে এবং ২০২৩ সাল থেকে বাস্তবায়ন শুরু নতুন কাঠামো। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে দেশের শিক্ষা কার্যক্রমকে সময়োপযোগী করা অপরিহার্য বলে মনে করেন। শিক্ষার্থীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

মহান শিক্ষা দিবস পালিত

১৭ই সেপ্টেম্বর নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হয় মহান শিক্ষা দিবস। এ দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক উপকমিটি আয়োজিত 'শিক্ষা: ২০৪১ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বাস্তবিক কৌশল' শীর্ষক এক সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী প্রশিক্ষিত শিক্ষক প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, শিক্ষায় শুধু পরীক্ষা আর সনদের মধ্যে আমরা আটকে ছিলাম। এখন তাই মূল্যায়নের পদ্ধতি বদলে ফেলেছি। আমাদের লক্ষ্য পড়াশোনার মধ্যে আনন্দ নিয়ে আসা। পড়াশোনা যাতে চাপে রূপ না নেয়।

অনুমোদন পেল শেখ হাসিনা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি

শেখ হাসিনা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি নামে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০-এর ৬ ধারা অনুযায়ী ২৪টি

শর্ত পালন সাপেক্ষে নতুন আরেকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে সরকার। কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার বাঁশগাড়ী নামে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি অস্থায়ীভাবে স্থাপন ও পরিচালনার সাময়িক অনুমোদন দিয়ে আদেশ জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা ডা. এইচবিএম ইকবালকে বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

wewb‡qvM: we‡kl cwZ‡e`b

চামড়া শিল্প খাতে সুইস উদ্যোক্তাদের আগ্রহ

বাংলাদেশে চামড়া শিল্প খাতে সুইজারল্যান্ডের উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে আগ্রহী বলে জানান বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত নাথালি চুয়ার্ড (Nathalie Chuard)। ১০ই অক্টোবর শিল্প মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে সুইস উদ্যোক্তাদের চামড়া শিল্প নিয়ে কাজ করার আগ্রহের কথা জানান। সুইজারল্যান্ডের উদ্যোক্তাদের আগ্রহকে সাধুবাদ জানান শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। এসময় শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সুইস রাষ্ট্রদূত সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক একটি ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের চিঠি মন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন এবং নিজে সাভারের ট্যানারি শিল্পনগরী পরিদর্শনের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। শিল্পমন্ত্রী তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সাভারের ট্যানারি শিল্পনগরীতে কেন্দ্রীয়ভাবে সেন্ট্রাল ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (সিইটিপি) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং এ সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ সমাধানের চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে তাদের যে-কোনো ধরনের সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে।

রেল খাতে বিনিয়োগে তুরস্কের আগ্রহ প্রকাশ

রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজনের সঙ্গে ১০ই অক্টোবর রেলভবনে তাঁর দপ্তরে বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মুস্তাফা ওসমান তুরান সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে রেল খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেন। রেলপথ মন্ত্রী এসময় তাঁর বক্তব্যে বলেন, রেল খাতে আমরা বিদেশি বিনিয়োগ খুঁজছি। বর্তমানে রেলওয়েতে অনেক প্রকল্প চলমান আছে এবং আগামীতে আরও অনেক প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন, রেল খাতের উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমরা বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিচ্ছি।

রাষ্ট্রদূত মুস্তাফা ওসমান তুরান বলেন, যে-কোনো দেশের পরিবেশবান্ধব, সহজ ও সাশ্রয়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে রেলওয়ে। বাংলাদেশ এবং তুরস্কের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। ভবিষ্যতে রেল খাতে বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এসময় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সেলিম রেজা, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক ধীরেন্দ্র নাথ মজুমদার, তুরস্ক দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর কেনান কালাইসি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: এইচ কে রায় অপু

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার লাভ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার' লাভ করেছেন। জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সল্যুশনস নেটওয়ার্কের নবম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ২০শে সেপ্টেম্বর তাঁকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন একথা জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২০শে সেপ্টেম্বর ২০২১ জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সল্যুশনস নেটওয়ার্কের নবম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 'এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়

দারিদ্র্য দূরীকরণ, পৃথিবীর সুরক্ষা এবং সবার জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণের সর্বজনীন আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদশকে সঠিক পথে এগিয়ে নেওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের সঞ্চালক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'জুয়েল ইন দ্য ক্রাউন অব দ্য ডে' হিসেবে সম্বোধন করেন। বিশ্বব্যাপী মহামারি চলাকালেও এসডিজি প্রচারণা কার্যক্রম চালাতে তাঁর নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও উন্নয়ন কৌশলবিদ অধ্যাপক জেফি ডি সচ বলেন, বাংলাদেশ বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন অনুসারে এসডিজির লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে।

কালাম ইয়ুথ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড পেল মাসুমা

'কালাম ইয়ুথ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০২১' সম্মাননা পেয়েছেন

বাংলাদেশের মেয়ে মাসুমা মরিয়ম। যুব উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকার জন্য ভারতের খোয়ার ফাউন্ডেশন সম্প্রতি এ পুরস্কার প্রদান করে। ভার্চুয়াল সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের মোট ২২ জনকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করছেন মাসুমা। ২০১৫ সাল থেকে নিজের প্রতিষ্ঠিত 'ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন' নিয়ে দেশের ও দেশের বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমাজ উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ করছেন। ২০২০ সালের কালাম ইয়ুথ লিডারশিপ কনফারেন্স-এ সেরা বক্তার পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। এছাড়া ন্যাশনাল ইয়ুথ আইকন অ্যাওয়ার্ড ২০১৯, আউটস্ট্যান্ডিং লিডারশিপ অ্যাজ এ ফ্রন্টলাইন ফাইটার ডিউরিং কোভিড-১৯, গ্লোবাল চেঞ্জমেকার অ্যাওয়ার্ড ২০২০ সম্মাননাও পেয়েছেন মাসুমা। উল্লেখ্য, ভারতের খোয়াব ফাউন্ডেশন সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আবুল কালাম আজাদের স্মরণে এবার তৃতীয়বারের মতো আয়োজন করে কালাম ইয়ুথ লিডারশিপ কনফারেন্স।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

বীর নিবাস পাচ্ছেন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা

রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলায় ৯ জন অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা পাচ্ছেন একটি করে নতুন বাড়ি। বাড়ির নাম রাখা হয়েছে 'বীর নিবাস'। 'মুজিববর্ষে কেউ গৃহহীন থাকবে না' সরকারের প্রতিশ্রুতির আলোকে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন নিরসনে এ প্রকল্প হাতে নিয়েছে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

এ প্রকল্পের আওতায় মুক্তিযোদ্ধাদের নিজস্ব ভিটায় পাকা দুটি বেডরুম, দুটি টয়লেট, একটি কিচেন, একটি ডাইনিং রুম ও একটি ড্রয়িং রুম থাকছে। একতলা বাড়িটির আয়তন হবে ৬৩৫ বর্গফুট। প্রতিটি আবাসন নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ১৩ লাখ ৪৩ হাজার ৬১৮ টাকা।

মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন নির্মাণ প্রসঙ্গে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, ইতোমধ্যে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। শিগগিরই বীর নিবাসের নির্মাণকাজ শুরু হবে। ৯টি আবাসন নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে এক কোটি ২০ লাখ ৯২ হাজার ৫৬২ টাকা।

দুর্গাপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা-বীরাঙ্গনা-শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত পদক্ষেপ ও উপহার হিসেবে এই প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার।

গৃহহীনদের মাঝে নতুন ঘরের চাবি

পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি প্রধানমন্ত্রীর উপহার গৃহহীনদের মাঝে নতুন ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং। মুজিববর্ষ উপলক্ষে চট্টগ্রামের তিন জেলার তিনশত গৃহহীন পরিবারের মাঝে নতুন ঘর দেওয়া হয়। এসময় তিনি বলেন, মানবতার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কল্যাণেই সারা দেশে গৃহহীন পরিবার জমির মালিকানাসহ নতুন ঘর পাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির সুবাতাস বইছে। আবার তাঁর হাত ধরেই উন্নয়নের জোয়ার বইছে। শেখ হাসিনার আন্তরিকতার কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচেকানাচে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

কফি ও কাজুবাদামের চারা বিতরণ

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ১৬ই সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার বেরিবাইদ ইউনিয়নের মাগন্তীনগর গ্রামে কৃষকদের মাঝে কফির চারা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এসময় কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশের পাহাড়ি অঞ্চল, বরেন্দ্র ও মধুপুর ভাওয়াল অঞ্চলের অনেক জায়গায় কাজুবাদাম ও কফি চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে আমরা কাজ করছি। সারা দেশের যেসব অঞ্চলে কাজুবাদাম এবং কফির চাষাবাদের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে, তা চাষের আওতায় আনতে 'কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ' শীর্ষক ২১১ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প-এর উদ্যোগে এই অঞ্চলে পাঁচ জন কৃষকের ৫০ শতাংশ জমিতে কফি ও কাজুবাদামের চারা রোপণ করা হচ্ছে। কৃষিমন্ত্রী একজন কৃষকের জমিতে কফি রোবাস্টা ও কফি অ্যারাবিকা এই দুই জাতের দুইটি কফির চারা রোপণ করে এই প্রকল্পের মাধ্যমে কফি ও কাজুবাদাম চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম, বারি'র পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. রিনা রানী সাহা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর টাঙ্গাইলের উপপরিচালক আহসানুল বাশার, কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প-এর প্রকল্প পরিচালক ড. মো. আলতাফ হোসেন প্রমুখ।

আলু রপ্তানি ও প্রক্রিয়াজাতকরণে সর্বাত্মক সহযোগিতা

আলু রপ্তানি ও প্রক্রিয়াজাতকরণে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হবে বলে জানান কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, দেশে বর্তমানে বছরে ১ কোটি টনেরও বেশি আলু উৎপাদিত হয়। অথচ বিদেশ থেকে চড়া দামে আলুর চিপস, প্রিঙ্গলস আমদানি করতে হয়। দেশে আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ভ্যালু অ্যাডে জড়িত

প্রতিষ্ঠানসমূহকে মানসম্পন্ন চিপস, প্রিঙ্গলস, ফ্রেঞ্চফ্রাই তৈরি করতে হবে। এছাড়া আলুর বহুমুখী ব্যবহার করে আর কী কী প্রোডাক্ট বানানো যায়–তা খুঁজে বের করতে হবে। ৫ই সেপ্টেম্বর রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন তিনি।

কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, অন্য আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হলো নিরাপদ ও রোগমুক্ত আলুর উৎপাদনের নিশ্চয়তা প্রদান। এলক্ষ্যে ইতোমধ্যে উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা (জিএপি) প্রণীত হয়েছে। টেস্টিং সুবিধা বাড়ানোর জন্য ঢাকার শ্যামপুরে একটি ল্যাব নির্মিত হয়েছে, এটির আধুনিকায়ন চলছে। পূর্বাচলে আরেকটি আধুনিক ল্যাব নির্মিত হবে। তিনি বলেন, দেশে আলু খুবই সম্ভাবনাময় একটি ফসল। আবহাওয়া ও মাটি আলু চাষের অনুকূল। আলুর বাজার ও চাহিদা বাড়াতে পারলে উৎপাদন অনেকগুণে বাড়ানো সম্ভব। এ বছর আলুর দাম কম। কৃষক ও কোল্ড স্টোরেজের মালিকেরা আলু বিক্রি নিয়ে উদ্বিগ্ন অবস্থায় রয়েছে। সেজন্য ফ্রেশ আলু প্রক্রিয়াজাত করে দেশে-বিদেশে বাজার বিস্তৃত করতে হবে। প্রাইভেট সেক্টরকে জিএপি বাস্তবায়ন করে কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের মাধ্যমে আলু উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান কৃষিমন্ত্রী। সভায় জানানো হয়, দেশে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১ কোটি ৬ লাখ টন আলু উৎপাদিত হয়েছে। রপ্তানি হয়েছে মাত্র ৫৫ হাজার টন, যার মূল্য প্রায় ৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের পদক্ষেপসমূহ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান বলেন, ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, ঘনবসতি ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগের মোকাবিলা করতে হয়। তাছাড়া ২০১৯ সালে ঘূর্ণিঝড় ফণী ও বুলবুল এবং ২০২০ সালে ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলা করতে হয়েছে বাংলাদেশকে। এসব ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় সরকারের পূর্বপ্রস্তুতি থাকায় জানমালের ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম হয়েছে। এ বছর ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' মোকাবিলায়ও সরকারের ব্যাপক প্রস্তুতি ছিল। দারিদ্র্যমোচনসহ সামাজিক নিরাপত্তা অর্জনে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে করেছে সমৃদ্ধ। দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছে সারা বিশ্বে।

প্রতিমন্ত্রী ৩রা অক্টোবর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২১ উপলক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডে করণীয় বিষয়ে সচেতনতামূলক মহড়া'য় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ, অগ্নিকাণ্ড, বজ্রপাত এবং ভূমিধস আমাদের অতি পরিচিত দুর্যোগ। জনসচেতনতা ও পূর্বপ্রস্তুতি থাকলে যে-কোনো দুর্যোগ মোকাবিলা করে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। আর শেখ হাসিনার সরকার সে কাজটাই করে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ত্রাণনির্ভর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আগাম সতর্কবার্তা প্রচার ব্যবস্থা শুরু করেন।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা থেকে মানুষের জানমাল রক্ষার্থে মাটির কিল্লা নির্মাণ করা হয়, যা সর্বসাধারণের কাছে 'মুজিব কিল্লা' নামে পরিচিত। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে অগ্রসর হয়েই বাংলাদেশ আজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় 'বিশ্বে রোল মডেল' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

বাংলাদেশের জলবায়ু কর্মকাণ্ডের প্রতি যুক্তরাজ্যের সমর্থন

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোমিনিক রাব ৬ই সেপ্টেম্বর কোপ-২৬ পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে বাংলাদেশ যে পদক্ষেপ নিয়েছে তার প্রতি যুক্তরাজ্যের সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। রাব ইউরোপে অবস্থানরত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় এই আশ্বাস দেন। ঢাকায় প্রাপ্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দুই নেতা বৈঠকে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে রাব কয়লা থেকে বাংলাদেশের পরিচ্ছন্ন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরে ব্রিটেনের সহায়তার আশ্বাস দেন।

জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্তদের গৃহনির্মাণ করবে সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিবিধ ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান বাংলাদেশ সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। পৃথিবীর প্রথম দেশ হিসেবে গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে এযাবৎ তিন হাজার ৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮০০টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু উপকূলীয় এলাকারই প্রায় তিন কোটি মানুষ উপকৃত হয়েছে। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গৃহহীনদের জন্য অধিক হারে গৃহনির্মাণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সরকার। পরিবেশ মন্ত্রী ১৪ই সেপ্টেম্বর মহাখালীর পুরাতন বন ভবনে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট যাতে স্বাবলম্বীভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য আইন সংশোধন, মাঠপর্যায়ে অফিস স্থাপন এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

we`y¨r: we‡kl cÖZ‡e`b

৯৯ ভাগেরও বেশি মানুষ বিদ্যুতায়নের আওতায়

বর্তমানে সাড়ে ৯৯ ভাগের বেশি জনগণ শতভাগ বিদ্যুতায়নের আওতায় এসেছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। তিনি বলেন, দেশের ৪৬১টি

উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু দুর্গম অফগ্রিড এলাকা ছাড়া মুজিববর্ষে গ্রিড-অফগ্রিড নির্বিশেষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম নিবিড় তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন হচ্ছে। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ১লা সেপ্টেম্বর সংসদ অধিবেশন টেবিলে উত্থাপিত প্রশ্নোত্তর পর্বে সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য মমতা হেনা লাভলীর প্রশ্নের লিখিত জবাবে প্রতিমন্ত্রী আরও জানান, চলমান শতভাগ বিদ্যুতায়নের কার্যক্রমের কারণে আবাসিক খাতে বিদ্যুতের ব্যবহার বেড়েছে। সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম ও ইকোনমিক জোনগুলো পর্যায়ক্রমে চালু হলে শিল্প খাতেও বিদ্যুতের ব্যবহার পর্যায়ক্রমে বাড়বে।

মহেশখালীতে চারশ কোটি টাকার বিদ্যুৎ হাব

কক্সবাজার থেকে সংযুক্ত সড়কের মাধ্যমে মাত্র তিন ঘণ্টার পথ মহেশখালীতে চলছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগের উন্নয়নযজ্ঞ। মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ঘিরে ৩১টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে শুধু বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি বিভাগেরই। এছাড়া সরকারের অন্যান্য পাঁচ মন্ত্রণালয় থেকে এখানে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে আরও ৬৮টি প্রকল্প। এসব প্রকল্পে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগের পক্ষ থেকে খরচ ধরা হয়েছে চারশ কোটি টাকা। সব প্রকল্প মিলিয়ে এক হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে এই মহেশখালীতে। বিশ্বের অন্যতম রোল মডেল হিসেবে দ্বীপটিকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে কাজ হচ্ছে বলে সংবাদ মাধ্যমকে ১৩ই সেপ্টেম্বর জানান বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

wbivc` moK : we‡kl cÖZ‡e`b

ড্রাইভিং লাইসেন্স বিতরণ

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ১১ই অক্টোবর থেকে আবারও ড্রাইভিং লাইসেন্স সরবরাহ করবে। শুরুতে আটকে থাকা ১২ লাখ ৪৫ হাজার ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছে বিআরটিএ এবং সেনাবাহিনীর অধীন মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি (বিএমটিএফ)।

বিআরটিএ'র সহকারী পরিচালক (ঢাকা মেট্রো-১ সার্কেল) শামসুল কবীর বলেন, আগামী ১০ই অক্টোবর থেকে পুরনো কার্ডগুলো প্রিন্ট হওয়ার কথা। ঐদিন প্রিন্ট হয়ে গেলে পরদিন থেকে লাইসেন্স বিতরণ শুরু হবে।

বিআরটিএ'র সড়ক নিরাপত্তা বিভাগের পরিচালক মাহবুব-ই-রব্বানী নিশ্চিত করেছেন, দ্রুত স্মার্ট কার্ড ছাপার কাজ শুরু হচ্ছে। সেনাবাহিনীর অধীন মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি (বিএমটিএফ) এই উদ্যোগ নিয়েছে। স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাপার কাজ শুরুর ছয় মাসের মধ্যে আটকে থাকা ১২ লাখ ৪৫ হাজার ড্রাইভিং লাইসেন্স সরবরাহের কাজ শেষ করবে প্রতিষ্ঠানটি।

বর্তমানে রাজধানীর পল্লবীতে অবস্থিত মাদ্রাজ সিকিউরিটি প্রিন্টার্সের এনরোলমেন্ট স্টেশনে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে প্রায় এক হাজার আবেদনকারীর আঙুলের ছাপ নেওয়া হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটি পাঁচ বছরে ৪০ লাখ স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স সরবরাহ করবে।

মহাসড়ক বিল ২০২১-এর রিপোর্ট চূড়ান্ত করার সুপারিশ

সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন করে মহাসড়ক বিল ২০২১-এর রিপোর্ট চূড়ান্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। কমিটির সভাপতি মো. একাব্বর হোসেনের সভাপতিত্বে সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় এ সুপারিশ করা হয়।

কমিটির সদস্য সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, এনামুল হক, মো. আবু জাহির, রেজওয়ান আহম্মদ তৌফিক,

মো. ছলিম উদ্দীন তরফদার, শেখ সালাহউদ্দিন, সৈয়দ আবু হোসেন এবং রাবেয়া আলীম সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় ইতঃপূর্বে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য কমিটিতে প্রেরিত 'মহাসড়ক বিল ২০২১' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। প্রয়োজনীয় সংযোজন, সংশোধন ও পরিমার্জনের পর বিলটি জাতীয় সংসদে পাসের উদ্দেশ্যে সংশোধিত আকারে রিপোর্ট প্রদানের জন্য কমিটি সুপারিশ করে।

সভায় সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সচিবদ্বয়, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব, বিআরটিএ ও বিআরটিসি'র চেয়ারম্যানদ্বয়, পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল প্রকল্পের পরিচালক, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীসহ সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

জরুরি স্বাস্থ্যসেবা দিতে অসম্মতি জানানো যাবে না

কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতাল, ক্লিনিকে ও চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হলে, সক্ষমতা থাকলে তারা ওই অসুস্থ ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক জরুরি স্বাস্থ্যসেবা দিতে অসম্মতি জানাতে পারবে না। ১২ই সেপ্টেম্বর এক রিটের শুনানিতে এ আদেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

আদালত বলেছে, যদি কোনো হাসপাতাল বা ক্লিনিকে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সক্ষমতা তথা ব্যবস্থা না থাকে, সেক্ষেত্রে জরুরি সেবা থাকা কাছের কোনো হাসপাতালে ওই ব্যক্তিকে পাঠাতে হবে। জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া দেশের বিদ্যমান সব সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের তালিকা, জরুরি চিকিৎসাসেবা বিভাগের তালিকা ও এর বর্তমান অবস্থা আদালতকে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে গণটিকা কার্যক্রম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিনে সারা দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে করোনার গণটিকা কার্যক্রম। ২৮শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এ কার্যক্রমে মোট ৭৮ লাখ ১১ হাজার ৬১৪ জনকে

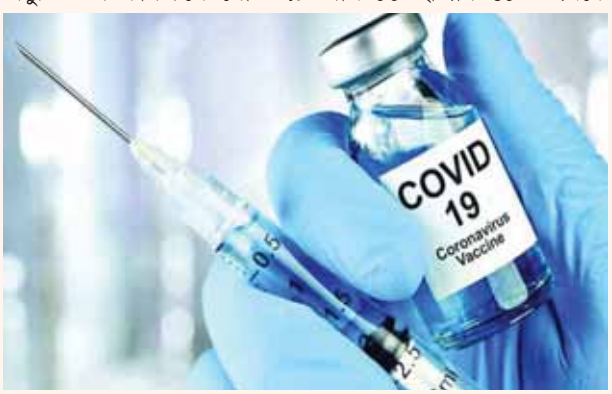

টিকা প্রদান করা হয়েছে, যদিও ৭৫ লাখ টিকা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, দুই দিনব্যাপী চলা এ কর্মসূচিতে ২৫ বছরের বেশি বয়সি ব্যক্তিরা এ টিকা পেয়েছেন। অগ্রাধিকার পেয়েছেন চল্লিশোর্ধ নারী ও প্রতিবন্ধীরা। বিশেষ এ কর্মসূচিতে দেওয়া হয়েছে প্রথম ডোজ। দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হবে আগামী ২৮শে অক্টোবর।

করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের পথে

দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ক্রমে নিয়ন্ত্রণে আসছে। সংক্রমিত নতুন রোগী, পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার, মৃত্যু–সবই কমছে। ৫ই অক্টোবর করোনা পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার ছিল ২.৭২। সাড়ে সাত মাসের মধ্যে এটি সর্বনিম্ন। এ নিয়ে টানা ১৫ দিন ধরে শনাক্তের হার ৫-এর নিচে রয়েছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী, কোনো দেশে টানা দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে রোগী শনাক্তের হার ৫-এর নিচে থাকলে করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে বলে ধরা হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য বুলেটিনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ এখন ভালো অবস্থানেই রয়েছে। সংক্রমণ পরিস্থিতি একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে এসেছে। পরিস্থিতি ভালো, তার মানে এই নয় যে, করোনা চলে গেছে। সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। মাস্ক পরিধান করতে হবে।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইন চালু

রেলমন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন বলেন, কক্সবাজারে রেললাইন চালুর অপেক্ষায় সারা দেশবাসী রয়েছে। ২০২২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দোহাজারী থেকে কক্সবাজার রেললাইন চালু করা হবে। ২২শে সেপ্টেম্বর দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু থেকে মিয়ানমারের নিকট ঘুনধুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্রাক নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শনের সময় কক্সবাজার শহরের কাছে আইকনিক স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ স্থানে উপস্থিত হয়ে রেলমন্ত্রী সাংবাদিকদের একথা বলেন।

কক্সবাজার রেললাইন চালু হলে পর্যটকদের ব্যাপকহারে আগমন ঘটবে। এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে। আইকনিক স্টেশনের বিভিন্ন সুবিধার কথা মন্ত্রী এসময় তুলে ধরে বলেন, এখানে যাত্রীরা এসে থাকতে পারবে, এমনকি তাদের মালামাল রাখার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। চকরিয়া থেকে মাতারবাড়ি পর্যন্ত নতুন ১৮ কিলোমিটার নতুন রেললাইন নির্মিত হবে বলে মন্ত্রী জানান। কক্সবাজারে বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে এবং এখানকার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হচ্ছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

রেলমন্ত্রী আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত একটি আত্মনির্ভরশীল দেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কাজ করে যাচ্ছেন। সকল সেক্টরে উন্নয়ন হচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে

একটি উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সারা দেশে অনেক মেগা প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। দোহাজারী থেকে কক্সবাজার রেললাইন নির্মাণ দশটি মেগা প্রকল্পের মধ্যে একটি। পরবর্তীতে রেলপথমন্ত্রী নির্মাণাধীন রেললাইন পরিদর্শন করেন। ইতোমধ্যে প্রায় ৬ কিলোমিটার রেললাইন বসানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এডিবি'র অর্থায়নে প্রথম পর্যায়ে দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০ কিলোমিটার নতুন সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ রেললাইন নির্মিত হচ্ছে । বর্তমানে এই প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৬২ শতাংশ। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কক্সবাজারকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনাসহ পর্যটকরা সাশ্রয়ী আরামদায়ক ও নিরাপদ ভ্রমণের সুযোগ পাবেন।

ওসমানী বিমানবন্দরে ছয় 'ই-গেট' স্থাপন

ই-পাসপোর্টধারীদের জন্য স্বয়ংক্রিয় ইমিগ্রেশন সেবা দিতে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইলেকট্রনিক গেট তথা ই-গেট ২১শে সেপ্টেম্বর চালু হয়েছে। এরই মধ্যে ছয়টি ই-গেট মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। কারিগরি অন্যান্য কাজ শেষ করে শিগগিরই এ সেবা কার্যক্রম চালু হবে বলে জানিয়েছে বিমানবন্দর সূত্র। এটি চালু হলে বিমানবন্দরের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে। ই-পাসপোর্টে থাকা মাইক্রোপ্রসেসর চিপ এবং অ্যান্টেনা স্ক্যান করে ই-গেট পাসপোর্টধারী ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করবে।

যাত্রীরা ই-গেটে পাসপোর্ট দেওয়ার পরই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে খুলে যাবে ফটক। তারপর মাত্র ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে শেষ হবে বিদেশগামীদের ইমিগ্রেশন কার্যক্রম। যাত্রী নিজে নিজে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন। বহির্গমনের জন্য তিনটি এবং প্রবেশের জন্য তিনটি গেট চালু থাকবে।

প্রতিবেদন : জাহিদ হোসেন নিপু

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহে ৭৮৬ শিক্ষক-কর্মকর্তার চাকরি স্থায়ীকরণ

দেশের টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহে ৭৮৬ জন কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক ও প্রশিক্ষক বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ নিয়ে সন্তোষজনক কর্মদক্ষতা অর্জন করায় তাদেরকে চাকরিতে স্থায়ী করে ১০ই অক্টোবর প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ইতোমধ্যে এ খাতে শিক্ষক সংকট পূরণ করতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। সম্প্রতি ৪ হাজার ২৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক সংকট পূরণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৭৮৬ জনের চাকরি স্থায়ী করা হয়। স্থায়ী হওয়া শিক্ষকগণ 'এসএসসি ও এইচএসসি ভোকেশনাল কোর্স প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৩টি নতুন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পে কর্মরত ছিলেন।

শ্রম অধিদপ্তরে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত ডাটাবেইজ উদ্‌বোধন

৩০শে সেপ্টেম্বর শ্রম ভবনের সম্মেলন কক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান শ্রম অধিদপ্তরের সেবাদি সহজীকরণ, সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে সহজে এক্সেসযোগ্য করতে অনলাইনভিত্তিক ডাটাবেইজ উদ্‌বোধন করেন। এসময় শ্রম

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত পাবলিকলি এক্সেসেবল ডাটাবেইজ উদ্‌বোধনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সফলতার আরও একটি পালক যুক্ত হলো। প্রতিমন্ত্রী এই ডাটাবেইজকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর ৭৫তম জন্মদিনের উপহার হিসেবে উল্লেখ করেন।

এই ডাটাবেইজে দেশব্যাপী শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত সকল ট্রেড ইউনিয়ন, প্রত্যাখ্যাত ও নথিজাতকৃত ট্রেড ইউনিয়নের তথ্যসমূহ, ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত মামলার তথ্য, অসৎ শ্রম আচরণ ও সালিশি সংক্রান্ত তথ্য, ফেডারেশন, সিবিএ নির্বাচন ও অংশগ্রহণকারী কমিটির হালনাগাদ তথ্যাদি সংরক্ষিত থাকবে। একজন ব্যবহারকারী শ্রম অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে ডাটাবেইজ থেকে হালনাগাদকৃত সকল ধরনের তথ্য দেখতে ও রিপোর্ট প্রিন্ট করতে পারবেন। সফটওয়্যারটি বাংলা এবং ইংরেজি দুইটি সংস্করণেই করা হয়েছে। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এহছানে এলাহী বলেন, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর সংশোধনী শেষ করা হবে।

বেসরকারি স্কুল ও কলেজ এমপিওভুক্তির গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

৩০শে সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ নতুন করে বেসরকারি স্কুল ও কলেজ এমপিওভুক্তির গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১০ই অক্টোবর ২০২১ থেকে

৩১শে অক্টোবর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইট (www.shed.gov.bd), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dshe.gov.bd) এবং বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)-এর ওয়েবসাইট (www.banbeis.gov.bd)-এ 'Online MPO Application' শিরোনামে প্রদর্শিত লিংকের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে।

প্রতিবেদন : ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনী

শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালার তৃতীয় তলায় ২৫শে সেপ্টেম্বর শুরু হয় বাংলাদেশ ও ভারতের দুই দেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে নিয়ে ডিজিটাল প্রদর্শনী 'বঙ্গবন্ধু-বাপু'।

ভারতীয় হাইকমিশন, বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও

শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত এ প্রদর্শনী ঢাকাসহ দেশের চারটি বিভাগে এবং ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রেও প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীটি উদ্‌বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। এ আয়োজনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ও ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি সচিব আবুল মনসুর। স্বাগত বক্তব্য দেন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। আলোচনা পর্ব শেষে শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রদর্শনী পর্ব শুরু হয়ে চলে ১১ই অক্টোবর পর্যন্ত।

নাচে-গানে শরৎ বন্দনা

রোদ ঝলমলে প্রভাবে গানের সুর, নাচের ছন্দে শরৎ উৎসব শুরু হয় ২৪শে সেপ্টেম্বর শিল্পকলা একাডেমির উন্মুক্ত মঞ্চে। করোনা মহামারি প্রতিরোধে আরোপিত বিধিনিষেধের পর রাজধানীতে এই প্রথম কোনো সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজিত হয়।

এদিন সকালে স্বপন সরকারের বাংলা ঢোলের বোলে সূচনা হয় এ উৎসবের। সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এই আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শরৎ উৎসবের উদ্‌বোধন করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্ব পর্যটন দিবসে পার্বত্য জেলা পরিষদের রোড-শো

পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত রোড-শোতে অংশগ্রহণকারী ১৬ জন সাইক্লিস্ট ২৯শে সেপ্টেম্বর বান্দরবান-রুমা-থানচি হয়ে আলীকদম উপজেলার ডিম পাহাড়ে পৌঁছান। এ সময় তাদেরকে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য দুংড়ি মং মার্মা, জনপ্রতিনিধি ও সাংবাদিকরা।

৩০শে সেপ্টেম্বর সাইক্লিস্টদের টিমপ্রধান বাংলাদেশ অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক মশিউর রহমান জানান, ১৬ জন সাইক্লিস্ট আলীকদম থেকে নাইক্ষ্যংছড়ি গিয়ে তাদের সফর শেষ করবেন। পর্যটন বিকাশে পার্বত্য জেলা পরিষদের উদ্যোগে তাদের এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এসময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো ও তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য পরিবেশন করে উপজাতীয় তরুণীরা।

বান্দরবানে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

বান্দরবানে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মাদকবিরোধী প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রীতি ফুটবল খেলায় মেঘলা দল ও নীলগিরি দল মুখোমুখি হলে ৩ গোলে জয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে নেয় নীলগিরি দল। ফুটবল খেলায় নীলগিরি বিজয়ী দলকে স্বাগতম জানান জেলা প্রশাসক।

৪ঠা অক্টোবর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আয়োজনে বান্দরবান স্টেডিয়ামে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে প্রীতি ম্যাচ ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণকারীসহ অনুষ্ঠান পরিচালনাকারীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

সেনাবাহিনীর উদ্যোগে সেলাই মেশিন বিতরণ

রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই জোনের পক্ষ থেকে বেকারত্ব দূর ও

আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে অসহায় নারীদের মাঝে বিদ্যানন্দ সংগৃহীত যাকাত ফান্ডের অর্থায়নে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। ৪ঠা অক্টোবর কাপ্তাই ৫৬ বেঙ্গলের কাপ্তাই জোনের জোন অধিনায়ক লে. কর্নেল আনোয়ার জাহিদ, পিএসসি-এর সার্বিক সহযোগিতায় রাজস্থলী ক্যাম্প অধিনায়ক মেজর মোহাম্মদ হাসান চৌধুরীর নেতৃত্বে ১নং ঘিলাছড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশের শীর্ষ রাজনীতিবিদ ও কর্মকর্তাদের ডোপ টেস্টের সুপারিশ

দেশের শীর্ষ রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ নানা শ্রেণি-পেশার কর্মকর্তাদের ডোপ টেস্টের সুপারিশ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

৩রা অক্টোবর জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এই সুপারিশ করা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অ্যাডভোকেট সামসুল হক টুকু। বৈঠকে উপস্থাপিত পুলিশের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, আইজিপি বেনজীর আহমেদ দায়িত্ব নেওয়ার পর বিট পুলিশিং কার্যক্রম আরও গতিশীল করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘটনা ঘটার আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ডিএমপি'তে ৮ মাসে মাদকবিরোধী অভিযান

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) চলতি বছরে জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত মাদকদ্রব্য উদ্ধার ও নিয়ন্ত্রণে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অবলম্বন করে ধারাবাহিক সাফল্য ধরে রেখেছে।

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের বিভিন্ন অপরাধ ও গোয়েন্দা বিভাগ মাদক মামলায় মোট ১৩,৯৪২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। আর এ সংক্রান্ত ডিএমপি'র বিভিন্ন থানায় গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৯,৮২১টি মামলা রুজু হয়েছে।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

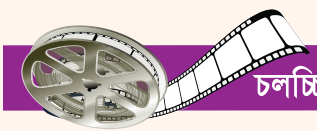

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

gvRe Avgvi wcZv চলচ্চিত্র

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আইসিটি ডিভিশনের অর্থায়নে নির্মিত হয় অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্র *মুজিব আমার পিতা*। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার *শেখ মুজিব আমার পিতা* গ্রন্থ অবলম্বনে এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন সোহেল রানা। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন ২৮শে সেপ্টেম্বর চলচ্চিত্রটির প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হয় এবং ১লা অক্টোবর থেকে টিকিটের মাধ্যমে সবার জন্য চলচ্চিত্রটি উন্মুক্ত করা হয়। এই চলচ্চিত্রের ব্যাপ্তিকাল ৪৮ মিনিট। এ চলচ্চিত্রের

কাহিনিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের একটি অংশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র *Rq evsjv*

সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র *জয় বাংলা*। লেখক, শিক্ষক মুনতাসীর মামুনের *জয় বাংলা* উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছে। পরিচালনা করেছেন প্রখ্যাত নির্মাতা কাজী হায়াৎ। এতে অভিনয় করেছেন– চিত্রনায়ক বাপ্পি চৌধুরী এবং জাহারা মিতু।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য জমা পড়ল ১৪টি চলচ্চিত্র

২০২০ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রতিযোগিতায় জমা পড়েছে ১৪টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। ২৮টি বিভাগে পুরস্কারের জন্য লড়াই করবে এই চলচ্চিত্রগুলো। ১৯শে সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রযোজকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র গ্রহণ করে তথ্য মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সচিব মমিনুল হক জানিয়েছেন, করোনার কারণে তুলনায় কম সংখ্যক চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে। এবার ১৪টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, সাতটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ও ছয়টি প্রামাণ্যচিত্র জমা পড়েছে।

১৪টি পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমাগুলোর মধ্যে আছে– *বীর, শাহেনশাহ, ঊনপঞ্চাশ বাতাস, গোর, বিশ্বসুন্দরী, একজন মহান নেতা, হলুদ বনি, গণ্ডি, রূপসা নদীর বাঁকে, আমার মা, চল যাই, জয়নগরের জমিদার, সুবর্ণরেখা* ও *হৃদয়জুড়ে*।

সাতটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে আছে– *কোথায় পাব তারে, আতর, সাদা গোলাপ, ফেরা, আড়ং, দ্য স্কায়ার্স* ও *আমার বাবার নাম*। ছয়টি প্রামাণ্যচিত্রের মধ্যে আছে– *স্বাধীনতার ডাকটিকিট, রথ যাত্রার বাকি ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়, বায়োগ্রাফি অব নজরুল, দ্য ফ্রন্ট পিয়ার্সম্যান ফজলুল হক* ও *নীলমুকুট*। ১৯৭৫ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রথম প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সরকার চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ ও

উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ব্যক্তি বিশেষকে এবং শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্রকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করে থাকে।

প্রতিবেদন: মিতা খান

wkï I wK‡kvi Dbqb : we‡kl cwZ‡e`b

বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বিমার লেনদেন স্কুল ব্যাংকিং-এ করা যাবে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বিমা' বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। জীবন বিমা করপোরেশনের সার্বিক পরিচালনায় এই বিমার আর্থিক লেনদেন

শিক্ষার্থীদের স্কুল ব্যাংকিং-এ করা যাবে। এজন্য কোনো সার্ভিস চার্জ বা ফি নেওয়া যাবে না। ১৯শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যানশিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট থেকে এ সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

বিশ্বে প্রথম শিশুদের ম্যালেরিয়া টিকা

শিশুদের জন্য বিশ্বে প্রথম ম্যালেরিয়া টিকা ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। ৬ই অক্টোবর সংস্থাটি এই অনুমোদন দেয়। বিবিসি জানায়, ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টার পর ম্যালেরিয়ার এই কার্যকর টিকা তৈরি চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্য এক বড়ো অর্জন।

বিশ্বের অন্যতম পুরনো ও প্রাণঘাতী রোগ এই ম্যালেরিয়া। মশাবাহিত এ রোগে প্রতিবছর সারা বিশ্বে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। এর বেশির ভাগই হয় আফ্রিকা অঞ্চলে। ম্যালেরিয়ায় প্রতিবছর পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুর মৃত্যু হয় দুই লাখ ৬০ হাজারের বেশি। 'আরটিএস,এস/এএস০১' নামের এই টিকা শুধু ম্যালেরিয়া নয়, যে-কোনো পরজীবীঘটিত রোগের বিরুদ্ধে তৈরি করা প্রথম কার্যকর টিকা।

করোনায় শিশুদের মনোজগৎ সুরক্ষায় পরিকল্পনার তাগিদ

শিশুদের করোনা আক্রমণ তুলনামূলক কম হলেও দীর্ঘ শিক্ষা বিরতি ও ঘরবন্দি হয়ে পড়াতে তাদের আচরণগত বড়ো পরিবর্তন ঘটেছে। এমন প্রেক্ষাপটে এবার ৪ঠা অক্টোবর পালিত হয় বিশ্ব শিশু দিবস। প্রতিবছর অক্টোবরের প্রথম সোমবার বিশ্বজুড়ে পালন করা হয় শিশু দিবস। একই দিন থেকে শুরু হয় শিশু অধিকার সপ্তাহ। এই দিবস ও সপ্তাহ উপলক্ষে সরকারি ও বেসরকারিভাবে ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য– 'শিশুর জন্য বিনিয়োগ করি, সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ি'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান বলেন, করোনার প্রভাবে শিশুদের আচরণগত বড়ো পরিবর্তন ঘটেছে। শিশুদের সঙ্গে মা-বাবা কিংবা পরিবারের অন্যদের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। শিশুদের ঘুমের সময়, রুটিন সবকিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। ডিভাইস অ্যাডিকশনে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে বেশির ভাগ শিশু। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বেড়েছে বিষন্নতার মাত্রা। তিনি বলেন, শিশুদের মনোজগতের এই বড়ো আঘাত সহজে স্বাভাবিক হবে না। এজন্য প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ধরে শিশুদের মানসিক বিকাশ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে কাজ করতে হবে। এখনকার আচরণের জন্য কোনোভাবেই তাদের দোষারোপ করা যাবে না। বা তাদের সঙ্গে বিরূপ আচরণ করা যাবে না।

প্রতিবেদন : নাসিমা খাতুন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

অসচ্ছল শিল্পীদেরকে অনুদানের শতকরা ৫ ভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ অনুদান খাত থেকে অসচ্ছল শিল্পীদের জন্য যে অনুদান প্রদান করা হয়, তার শতকরা ৫ ভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে। প্রতিমন্ত্রী ১লা অক্টোবর রাজধানীর বনানীস্থ সারিনা হোটেলে ঢাকা থিয়েটার ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের যৌথ আয়োজনে ও 'সুন্দরম' প্রতিবন্ধী নাট্যপ্রয়াসের সহযোগিতায় 'প্রতিবন্ধী নাট্যকর্মশালার সমাপনী' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেন, প্রতিবন্ধী শিল্পীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এ কর্মশালায় অভিনয় ও পারফরম্যান্স দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ ও অভিভূত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যে সত্যিই মেধাবী ও সৃজনশীল এটি তার সাক্ষর বহন করে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও সঠিক বিকাশে বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ও রোল মডেলের ভূমিকা পালন করছেন। তিনি আরও বলেন, ঢাকা থিয়েটার ও ব্রিটিশ কাউন্সিল চাইলে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ প্রোগ্রামে অংশীদার হতে আগ্রহী। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঢাকা থিয়েটারের সভাপতি নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু ও ব্রিটিশ কাউন্সিল, ঢাকার হেড অব আর্টস নাহিন ইদ্রিস এবং উপস্থিত ছিলেন ঢাকা থিয়েটারের ক্রিয়েটিভ ডাইরেক্টর সামিউন জাহান দোলা।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে এসএমএস পাঠিয়ে ঘর পেলেন প্রতিবন্ধী বাবু

মাগুরা সদর উপজেলার রামনগরের প্রতিবন্ধী কলেজছাত্র বাবু মিয়া (২২) নিজের দুরাবস্থার কথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফোন নম্বরে এসএমএস পাঠিয়ে জানিয়ে জমিসহ পাকা ঘর পেল। মোবাইল ফোনের ক্ষুদেবার্তায় প্রধানমন্ত্রীকে গত এপ্রিলে নিজের অসহায়ত্বের কথা জানিয়েছিলেন মাগুরার প্রতিবন্ধী কলেজছাত্র বাবু মিয়া। এসএমএস'টি পেয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর দপ্তর থেকে মাগুরা জেলা প্রশাসকের দপ্তরে যোগাযোগ করে বাবু মিয়ার খোঁজখবর নিয়ে তাকে একটি ঘর দেওয়ার নির্দেশ দেন। বাবু মিয়াকে মাগুরা সদরের হাজরাপুর ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় দুই শতক সরকারি খাস জমিতে দুই কক্ষের একটি সেমি পাকা ঘর করে ৪ঠা সেপ্টেম্বর বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এসময় মাগুরা জেলা প্রশাসক ড. আশরাফুল আলম সদরের হাজরাপুর ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় উপস্থিত থেকে প্রতিবন্ধী বাবু মিয়ার কাছে বাড়ি ও জমির দলিল বুঝিয়ে দেন। বাবু মিয়া মাগুরা আদর্শ ডিগ্রি কলেজের স্নাতক শ্রেণির ছাত্র।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি

আন-অফিসিয়াল ওয়ার্ম-আপ ম্যাচে ওমান 'এ' দলকে ৬০ রানের বড়ো ব্যবধানে হারিয়ে লিটন দাসের দল দেখিয়ে দিয়েছে বৈশ্বিক ক্রিকেট আসরের জন্য ব্যাটে-বলের প্রস্তুতিটা ভালোই হয়েছে তাদের। আল আমেরাত ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টস হেরে লিটন দাসের নেতৃত্বে ব্যাট হাতে নেমে নাঈম-লিটনের ফিফটিতে ৪ উইকেটে ২০৭ রানের সংগ্রহ করে বাংলাদেশ একাদশ। পিঠের চোটের জন্য মাঠে ছিলেন না টাইগারদের টি-টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। ইনিংস উদ্‌বোধন করে ওপেনার লিটন দাস সাজঘরে ফেরেন ৫৩ রান নিয়ে। আর ৬৩ রানের দুরন্ত এক ক্রিকেটীয় ইনিংস খেলে রিটায়ার্ড হার্ট হন লিটনের ওপেনিং সঙ্গী মোহাম্মদ নাঈম।

২০৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ওমান 'এ' দল ৯ উইকেটে গুটিয়ে যায় ১৪৭ রানে। ফলে ৬০ রানের সহজ জয় পায় বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিবশতবর্ষে আয়োজিত টুর্নামেন্টের নাম বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট। প্রধান পৃষ্ঠপোষক ইস্পাহানি গ্রুপ। বাংলাদেশ স্কোয়াশ র‍্যাকেটস ফেডারেশন আয়োজিত টুর্নামেন্টে দেশ-বিদেশের ২৪ জন প্রখ্যাত স্কোয়াশ খেলোয়াড় অংশ নিচ্ছেন। এ উপলক্ষে ৯ই অক্টোবর ঢাকার হোটেল পূর্বাণীর দিলকুশার হলরুমে আয়োজিত মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার ট্রফি উন্মোচন হয়। ২০-২৪শে অক্টোবর এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রবেশ করছে পিএসএ ট্যুর ইভেন্ট আয়োজনকারী দেশের তালিকায়। পিএসএ বা প্রফেশনাল স্কোয়াশ অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে পেশাদার স্কোয়াশের বিশ্বব্যাপী

পরিচালনাকারী সংস্থা। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক স্কোয়াশ টুর্নামেন্টে অংশ নিবে ইরান, মিসর, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

টি-২০ বিশ্বকাপের বিজয়ী দলকে দেওয়া হবে ১৬ লাখ ডলার। টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া সব দলের জন্যই রয়েছে আর্থিক পুরস্কার। এ আসরের জন্য মোট ৫৬ লাখ ডলার বরাদ্দ করেছে আইসিসি। ১০ই অক্টোবর এক বিজ্ঞপ্তিতে তারা প্রকাশ করেছে এবারের আসরের প্রাইজমানি। রানার্সআপ দল পাবে আট লাখ ডলার পুরস্কার। সেমিফাইনাল থেকে বাদ পড়া দুই দল পাবে চার লাখ ডলার করে। প্রতিযোগিতাকে আরও আকর্ষণীয় করতে প্রতিটি ম্যাচ জেতার জন্যও রাখা হয়েছে পুরস্কার। সুপার টুয়েলভের ৩০ ম্যাচের প্রতিটিতে জয়ী দল পাবে ৪০ হাজার ডলার করে। সুপার টুয়েলভ থেকে বাদ পড়া দলগুলোর জন্যও রয়েছে বরাদ্দ। প্রতিটি দলকে ৭০ হাজার ডলার করে দেবে আইসিসি। প্রথম রাউন্ডে প্রতি ম্যাচ জেতার পুরস্কার ৪০ হাজার ডলার। ১২ ম্যাচের প্রথম রাউন্ড থেকে বাদ পড়া দলগুলোকে দেওয়া হবে ৪০ হাজার ডলার করে।

প্রতিবেদন : মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

চলে গেলেন শিশুসাহিত্যিক রফিকুল হক দাদুভাই

আফরোজা রুমা

জনপ্রিয় শিশুসাহিত্যিক, ছড়াকার, শিশু সংগঠক, নাট্যকার ও প্রবীণ সাংবাদিক রফিকুল হক দাদুভাই চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ১০ই অক্টোবর মুগদার বাসায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ৮৪ বছর বয়সি রফিকুল হক বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। তার মধ্যে গত বছর পরপর দুইবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁকে। সুস্থ হয়ে কর্মস্থল *যুগান্তরে* যোগ দিলেও পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে মাস ছয়েক আগে পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন তিনি। মৃত্যুর আগে তিনি স্ট্রোক করেন।

রফিকুল হকের জন্ম ১৯৩৭ সালের ৮ই জানুয়ারি রংপুর সদর উপজেলার কামাল কাছনা মহল্লায়। তবে আদিনিবাস পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার শহরে। তাঁর বাবার নাম ইয়াছিন উদ্দিন আহম্মদ, মাতার নাম রহিমা খাতুন। তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে ১৯৬৩ সালে বিএ পাস করেন। এছাড়াও তিনি জুরিখের ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট (আইপিআই) থেকে সাংবাদিকতায় উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন।

রফিকুল হক বহু বাংলা সংবাদপত্রে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬৯ সাল থেকে তিনি পৃষ্ঠাসজ্জা (পেজ মেকআপ) করেছেন। শিফ্‌ট-ইনচার্জ হিসেবে *দৈনিক পূর্বদেশে* তিনি পৃষ্ঠাসজ্জা করতেন। ১৯৭৫ পর্যন্ত তিনি *দৈনিক পূর্বদেশ* পত্রিকার ফিচার এডিটরের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত তিনি *কিশোর বাংলা* পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি *দৈনিক রূপালী* পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি *দৈনিক লাল-সবুজ*, *আজাদ*, *বাংলাদেশ অবজারভার* প্রভৃতি পত্রিকাতেও কাজ করেছেন। ২০০৪ সাল থেকে তিনি *দৈনিক যুগান্তর* পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন।

তিনি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *কিশোর বাংলা* পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এটি ছিল একটি জাতীয় সাপ্তাহিক। তাঁর দক্ষ সম্পাদনায় কিশোরদের জন্য নিয়মিত সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে এটি জনপ্রিয়তা লাভ করে।

আশির দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য 'নিধুয়া পাথার কান্দে' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন রফিকুল হক, যা পরে দারুণ জনপ্রিয়তা পায়। *বর্গি এলো দেশে*'সহ তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা সাতটি। বইগুলো হলো– *পান্তাভাতে ঘি*, *নেবুরপাতা করমচা*, *আম পাতা জোড়া জোড়া*, রফিকুল হক দাদুভাই-এর সমকালীন ছড়া, *বই বই হই চই* এবং *প্রাচীন বাংলার রূপকথা*।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর দেশে ফিরে আসা উপলক্ষে *দৈনিক পূর্বদেশ* একটি বিশেষ সংখ্যা বের করে। ঐ পত্রিকার প্রথম পাতায় বঙ্গবন্ধুর ছবির সাথে 'ঘরে ফিরা আইসো বন্ধু' শিরোনামে রফিকুল হকের একটি কবিতা ছাপা হয়, যা আলোচিত হয়।

বাংলা শিশুসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য রফিকুল হক দাদুভাই ২০০৯ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একই বছর বাংলাদেশ শিশু একাডেমি পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার, চন্দ্রাবতী একাডেমি পুরস্কার, নিখিল ভারত শিশুসাহিত্য পুরস্কার এবং বিশ্ব সাহিত্য সম্মেলনে (পাটনা ভারত) ক্রোল অব অনার লাভ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশিষ্ট ছড়াকার ও সাংবাদিক রফিকুল হক দাদুভাইয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

প্রথমে দাদুভাইয়ের মরদেহ বিকালে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে নেওয়া হয়। সেখানে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, পরিচালক জালাল আহমেদসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে অতিরিক্ত সচিব মো. শওকত আলী এবং যুগ্মসচিব এ জে এম আব্দুল্যা হেল বাকী রফিকুল হক দাদুভাইয়ের মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। এছাড়া দাদুভাইয়ের মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদনে অংশ নেন কবি জাফর আহমদ রাশেদ, প্রকাশক দীপঙ্কর দাশ, কবি ইমরোজ সোহেল, বাপ্পি সাহা, তৌহিদুর ইসলাম কনক, রুবেল আহম্মেদ। শ্রদ্ধা নিবেদন পর্ব শেষে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রয়াত রফিকুল হক দাদুভাইয়ের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

তারপর আসরের পর যুগান্তর প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে এবং মাগরিবের পর বাসাবো জামে মসজিদে দুই দফা জানাজার পর মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 42, No. 05, October 2021, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd